বাংলাদেশ মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০১৮

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সংবিধানে একটি সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ই বেশিরভাগ ক্ষমতার অধিষ্ঠানস্থল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ গত ডিসেম্বরে টানা তৃতীয়বারের মতো ৫ বছর মেয়াদে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনটি ছিল ভীষণভাবে একপেশে । এই নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। বিরোধীদলের সমর্থক ভোটার ও নির্বাচনী এজেন্টদের ভয়ভীতি দেখানো ও জাল ভোটে ব্যালট বাক্স ভরাসহ নানা ধরনের অনিয়মের অভিযোগ একে কালিমালিপ্ত করেছে।

নির্বাচনী প্রচারণা চলার সময় প্রতিপক্ষকে হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও সহিংসতার অনেক বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ ওঠে। এর ফলে বিরোধীদলের অনেক প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের জন্য সভা-সমাবেশ এবং প্রচারের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে।

একটি বিশ্বাসযোগ্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ মিশন সফল করতে যে সময় দরকার সেই সময়সীমার মধ্যে আন্তর্জাতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের অনেককেই অ্যাক্রেডিটেশন এবং ভিসা দেওয়া হয়নি। স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের ২২টি এনজিওর মধ্যে মাত্র সাতটিকে অনুমতি দেওয়া হয়।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর ওপর বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ছিল।

বাংলাদেশে যেসব মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যু রয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বিচারবহির্ভূত বা নির্বিচার হত্যা, গুম, নির্যাতন, সরকার কর্তৃক বা তার পক্ষ হয়ে যথেচ্ছ বা বেআইনিভাবে আটক করা, কারাগারের কঠিন ও জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করা পরিবেশ, রাজনৈতিক কারণে বন্দী রাখা, যথেচ্ছ বা বেআইনিভাবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লংঘন, সেন্সরশিপ, ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেওয়া বা অপরাধের তকমা এঁটে দেওয়া, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার অধিকারের ওপর বড় ধরনের হস্তক্ষেপ যার মধ্যে আছে অতি নিয়ন্ত্রণমূলক এনজিও বিষয়ক আইন এবং এনজিও কার্যক্রমের ওপর বিধিনিষেধ, চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা ও রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণে নিয়ন্ত্রণ যে কারণে একটি প্রকৃত, অবাধ, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। এর বাইরে দুর্নীতি, মানবপাচার, সমকামী, উভকামী, তৃতীয় লিঙ্গ ও ইন্টারসেক্স (এলজিবিটিআই) গোষ্ঠীর মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও সমকামী যৌন ক্রিয়াকলাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা, স্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়ন ও শ্রমিক অধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং নিকৃষ্টতম পর্যায়ের শিশুশ্রম।

অন্যায়মূলক কর্মকাণ্ডে জড়ানোর পরও আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত বাহিনীর সদস্যদের রেহাই দেওয়ার অনেক খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের হাতে যেসব হত্যা ও নির্যাতনের ঘটনার কথা খবরে এসেছে, সরকার তার খুব কম ঘটনারই তদন্ত ও বিচার করেছে।

জাতিসংঘ বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন শান্তি মিশনে যাওয়া শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে তিনটি যৌন হয়রানি ও অসদাচরণের অভিযোগ এনেছিল। সেই অভিযোগগুলো অনিষ্পন্ন ছিল।

সেকশন ১: ব্যক্তির জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা , যার মধ্যে থাকবে

ক. যথেচ্ছভাবে জীবনহানি এবং অন্যান্য আইনবহিভর্‌ত বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হত্যাকাণ্ড থেকে সুরক্ষা

সংবিধান নাগরিকদের বেঁচে থাকার অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তবে সরকার বা তার এজেন্টরা বহু স্বেচ্ছাচারমূলক বা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে জানা গেছে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বছরজুড়ে নানা জায়গায় অভিযান চালিয়েছে, প্রধানত সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমন করতে। কিছুসংখ্যক অভিযান, গ্রেপ্তার ও অন্যান্য আইনশৃংখলা তৎপরতার সময় সন্দেহজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রায়শই এ ধরনের মৃত্যুর যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা হচ্ছে: অস্ত্র উদ্ধার বা সহযোগীদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য আসামিকে নিয়ে অপরাধ সংঘটনের স্থানে অভিযানে যাওয়ার পর সেখানে ঘাঁপটি মেরে থাকা সঙ্গীরা পুলিশের ওপর গুলি করে। তখন দুপক্ষের গুলিবিনিময়ের সময় আসামির মৃত্যু হয়। সরকার সাধারণত এই ধরনের ঘটনাকে 'ক্রসফায়ার হত্যা', 'বন্দুকযুদ্ধ' অথবা 'এনকাউন্টার হত্যা' বলে বর্ণনা করে। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) অথবা পুলিশের অন্য কোনো ইউনিটের সঙ্গে অপরাধীদের গুলিবিনিময় বোঝাতে এসব টার্ম ব্যবহার করা হয়। মিডিয়া কখনো কখনো পুলিশের বৈধ শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রেও এসব টার্ম ব্যবহার করেছে। তবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে, ক্রসফায়ারের অনেক ঘটনাই আসলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানবাধিকার সংগঠনগুলো দাবি করেছে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন সন্দেহভাজন লোককে প্রথমে আটক, নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং পরে যেখান থেকে তাকে ধরা হয়েছিল সেখানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছে। পরে তারা বলেছে, সহিংস হামলার মুখে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার আইনসম্মত আত্মরক্ষার সময় ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

'হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি' (এইচআরএসএস) নামে স্থানীয় একটি মানবাধিকার সংগঠন তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, নিরাপত্তা বাহিনী জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে ক্রসফায়ারের ঘটনায় চার শর বেশি লোককে হত্যা করেছে। 'অধিকার' নামের আরেকটি মানবাধিকার সংগঠন বলেছে, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর ক্রসফায়ারের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা ৪১৫ জন।

মাদকদ্রব্যের সমস্যা সমাধানে মে মাসে সরকার মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়েছিল। এ অভিযানের ফলে গত বছরের তুলনায় বেশি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর খবর অনুযায়ী, মে থেকে জুন মাস পর্যন্ত ওই অভিযানে ২৩০ জন কথিত মাদক কারবারি নিহত হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ১৭ হাজার ব্যক্তিকে। মানবাধিকার সংগঠন ও সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে এই সব কথিত বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও ব্যাপক গ্রেপ্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তাদের পক্ষ থেকে বলা হয়, নিহত বা আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক নিরপরাধ লোক রয়েছে এবং সরকার আসলে নির্বাচনকে সামনে রেখে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে জনসাধারণের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে চেয়েছে।

র‍্যাবের তথ্য মতে, ২৬ মে তাদের সঙ্গে মাদক কারবারিদের গোলাগুলির সময় কক্সবাজার জেলার টেকনাফ পৌরসভার কাউন্সিলর একরামুল হক গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। একরামুল হকের পরিবারের সদস্যরা তিনি মাদক কেনাবেচার সঙ্গে জড়িত ছিলেন মর্মে র্যাবের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, একরামুলের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে সাদা পোশাকধারী কিছু সরকারি লোক সাম্প্রতিক কোনো জমি কেনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের কথা বলে তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যান। একরামুলের এলাকার লোকজনও তার মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগের বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

'অধিকার' বলেছে, বছরের প্রথম ১০ মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হেফাজতে ৫৭ জনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

পত্রপত্রিকার খবর অনুযায়ী, সাদা পোশাকধারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা ৬ মার্চ বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদলের নেতা জাকির হোসেন মিলনকে বিচারকাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেন। জিজ্ঞাসাবাদের সময় মিলন 'অসুস্থ' বোধ করার কথা বলেন এবং ১২ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ডিএমসিএইচ) পাঠানোর পর সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। মিলনের পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, ডিএমসিএইচ থেকে মিলনের লাশ নেওয়ার পর তাঁরা দেখেছেন, তাঁর হাতের নখ ওপড়ানো এবং শরীরের নিম্নাংশে কয়েকটি গুরুতর ক্ষতচিহ্ন।

স্থানীয় পদ বা এলাকার আধিপত্য নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের উপদল ও সদস্যদের মধ্যে সহিংস দলীয় কোন্দল হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাতে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। মানবাধিকার সংগঠন 'আইন ও সালিস কেন্দ্র' (আসক) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত রাজনৈতিক সহিংসতায় ৩০ জনের মতো নিহত ও ২৮৫০ জন আহত হয়েছে।

এ বছর দুটি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ৩ মার্চ ফয়জুর রহমান নামের এক যুবক সিলেটের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলা চালান। জাফর ইকবাল 'ইসলামের শত্রু' এরকম ধারণার বশবর্তী হয়ে ফয়জুর রহমান তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল বাংলাদেশে ইসলামপন্থী রাজনীতি ও সমাজে ক্রমবর্ধমান অসহিষ্ণুতার কঠোর সমালোচনা করে আসছিলেন। পুলিশের কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্র্যান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ) তদন্ত করে জেনেছে, ফয়জুর রহমানের সঙ্গে সন্ত্রাসী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের ইন্টারনেট ফোরাম 'দাওয়াহ্ ইল্লাল্লাহ্'-এর যোগাযোগ ছিল। হামলার সময় শিক্ষার্থীরা ফয়জুরকে ধরে ফেলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করে। হামলায় অধ্যাপক জাফর ইকবালের মাথা ও শরীরের ঊর্ধাংশ জখম হয়।

খ. গুম থেকে সুরক্ষা

মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমগুলো বলেছে, আগের মতো এ বছরও গুম ও অপহরণ অব্যাহত ছিল। এসব গুম ও অপহরণের জন্য তারা মূলত নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকেই দায়ী করেছে। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ বা তদন্তে সরকারের তৎপরতা ছিল সীমিত। কিছু লোক কথিত গুম হওয়ার পর দেখা গেছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে কোনো রকম অভিযোগ ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু লোককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। নিরাপত্তা সংস্থা কিছু লোককে মৃত অবস্থায় পাওয়ার কথা বলেছে এবং বাকিদের খোঁজ কখনোই পায়নি। এইচআরএসএস বলেছে, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৮ জন গুম হয়েছে। 'অধিকার' এর হিসাব মতে, জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গুম হয়েছে মোট ৮৩ জন।

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দণ্ডিত হয়েছেন এমন তিনজন সাবেক বিরোধীদলীয় রাজনীতিকের ছেলেদের ২০১৬ সালে কর্তৃপক্ষ আটক করে। তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে আটক বা অভিযুক্ত করা হয়নি। হুম্মাম কাদের চৌধুরীকে ধরার সাত মাস পরে ছেড়ে দেওয়া হলেও মীর আহমাদ বিন কাশেম ও আমান আজমি বছরের শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ ছিলেন। গুম বিষয়ক জাতিসংঘ ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইউএন ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড্ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সেস) বাংলাদেশ সফরের অনুমতি চেয়ে আবেদন করলেও সরকারের দিক থেকে সাড়া দেওয়া হয়নি।

সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গুমের ঘটনার কথা বার বার অস্বীকার করেছেন। তাঁদের দাবি ছিল, নিখোঁজ ব্যক্তিরা নিজেরাই বিভিন্ন কারণে আত্মগোপন করে আছেন। ২০১৭ সালে একটি বিচারবিভাগীয় তদন্তে বলা

হয়, লোকের গুম হওয়ার ঘটনা সত্যিই ঘটেছে। এতে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) এ বিষয়ে অনুসন্ধানেরও আদেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো বলেছে, তারা সারা বছর ধরেই এ বিষয়ে তদন্ত চালিয়ে গেছে।

গ. নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ অথবা সাজা থেকে সুরক্ষা

সংবিধান ও আইন নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ অথবা সাজা নিষিদ্ধ করলেও মানবাধিকার সংগঠন ও সংবাদমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা এ ধরনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সন্দেহভাজন জঙ্গি ও বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের কাছ থেকে তথ্য বের করতে তারা নিষ্ঠুর নির্যাতন করেছেন বলে জানা গেছে। নিরাপত্তা সংস্থার লোকেরা হুমকি, মারধর, পায়ে গুলি করা ও বৈদ্যুতিক শকের মতো কৌশল প্রয়োগ করেছেন। অনেক সময় তারা ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনও করেছেন বলে খবরে এসেছে। 'অধিকার' তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, নির্যাতনের কারণে বছরের প্রথম দশ মাসে পাঁচজন মারা গেছে।

দেশের আইনে এমন ধারা রয়েছে যার মাধ্যমে একজন ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আইনি হেফাজতে (এখানে 'রিমান্ড' নামে পরিচিত) নেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। রিমান্ডে সন্দেহভাজন ব্যক্তির আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়াই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যায়। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অভিযোগ, এ ধরনের জিজ্ঞাসাবাদের সময় বহু লোককে নির্যাতন করা হয়েছে।

৪ মে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা অপহরণকারী সন্দেহে আশরাফ আলী নামের একজনকে আটক করে। ৩৫ ঘণ্টা আটক রাখার পর আশরাফকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিন ঘণ্টা পর তিনি মারা যান। চিকিৎসকেরা বলেছেন, আশরাফের শরীরের নিচের অংশে গুরুতর আঘাত এবং পেটের ভেতরে অন্ত্রে প্যাঁচ লাগা ছিল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী, স্বাভাবিক কারণে আশরাফ আলীর মৃত্যু হয়েছে মর্মে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য গোয়েন্দা পুলিশের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের চাপ দেওয়া হয়েছিল। তবে আশরাফকে হাসপাতালে খারাপ অবস্থায় নেওয়া হয়েছিল বলে চিকিৎসকেরা ডিবির কথামতো রিপোর্ট দিতে রাজি হননি। আশরাফ আলীর পরিবারের সদস্যরা বলেছেন, হার্নিয়ার সমস্যা থাকলেও মোটের ওপর তিনি সুস্থই ছিলেন।

নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সময় একটি টেলিভিশনের প্রতিবেদনে 'উসকানিমূলক বক্তব্য' দেওয়ার কারণে ৫ আগস্ট ফটোসাংবাদিক শহীদুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয় (সেকশন ২. ক দেখুন)। ৬ আগস্ট শহীদুলকে যখন আদালতে তোলা হয় তখন দৃশ্যত তিনি অন্যের সহযোগিতা ছাড়া হাঁটতে পারছিলেন না। তাঁর শরীরে আঘাতের চিহ্নও দেখা যায়। মুখ্য মহানগর হাকিমের সামনে দেওয়া সাক্ষ্যে শহীদুল অভিযোগ করেন, প্রথম রাতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর চোখ বেঁধে রাখা হয়েছিল। এছাড়া মাথায় ভারী বোঝা চাপানো এবং মুখে আঘাত করা হয়। আইন অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষার একদিন পর ৯ আগস্ট আদালতে যে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়, তাতে বলা হয় শহীদুল আলম 'শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ'। ২২ আগস্ট শহীদুল আলমের স্ত্রী রেহনুমা আহমেদ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শহীদুলকে হাসপাতালে ভর্তি করার অনুরোধ জানান। রেহনুমা ওই সময় বলেন, তিনি জেলখানায় দেখা করার সময় তাঁর স্বামী বলেছেন, কারাগারে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত সমস্যা, মাড়িতে ব্যথা ও চোখে দেখার সমস্যা হচ্ছে। রেহনুমা

বলেন, আটক হওয়ার আগে শহীদুলের এসব শারীরিক সমস্যা ছিল না। শহীদুল জামিনে ছাড়া পান নভেম্বরের ২০ তারিখে।

জাতিসংঘের মতে, ২০১৫-২০১৭ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তি মিশনের বাংলাদেশি সদস্যদের বিরুদ্ধে তিনটি যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের অভিযোগ উত্থাপিত হলেও এসব অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি। হাইতিতে মোতায়েন ইউএন স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে মোতায়েন ইউএন অর্গানাইজেশন স্ট্যাবিলাইজেশন মিশনে এসব ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। কথিত অপরাধের মধ্যে যৌন নিপীড়ন (শোষণমূলক সম্পর্ক, লেনদেনভিত্তিক যৌনতা) ও যৌন নিগ্রহ (অপ্রাপ্তবয়স্কদের ওপর যৌন নির্যাতন) দুটিই ছিল। এর মধ্যে জাতিসংঘের তদন্তে দুটি অভিযোগের পক্ষে তথ্য প্রমাণ মিলেছে। জাতিসংঘ অভিযুক্ত শান্তিরক্ষীদের দেশে পাঠিয়ে দেয়। তবে বছরের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের তদন্ত অসমাপ্ত ছিল।

<u>কারাগার ও হাজতখানার অবস্থা:</u>

বাংলাদেশের কারাগারের অবস্থা শোচনীয়। ধারণক্ষমতার অনেক বেশি বন্দি, সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি ও যথাযথ স্যানিটেশনের অভাবে এর পরিবেশ কখনো কখনো বন্দিদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো প্রাইভেট হাজতখানা নেই। আইন ও সালিস কেন্দ্রের দাবি, কয়েদখানার এই অবস্থা হেফাজতে মৃত্যুর অন্যতম কারণ। তাদের হিসাব অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭৪ জন কারা হেফাজতে মারা গেছে।

<u>ভৌত কাঠামোর অবস্থা:</u> কারা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে ৩৭ হাজার কয়েদি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগারগুলোতে মোট বন্দি ছিল ৯৫ হাজারের বেশি। কারা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় বিচার শুরু হয়নি এমন হাজতিদেরও দণ্ডিত আসামিদের সঙ্গে রাখে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে সরকারি হিসাবে ৩৬ হাজার বন্দি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কারাগারগুলোতে ৯০ হাজারের বেশি কয়েদি ও হাজতি ছিল। স্থানাভাবে কয়েদিরা পালা করে ঘুমাতেন। তাঁদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক টয়লেট ছিল না। ২০১৬ সালে মিডিয়া ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো জানিয়েছিল, কিছু কয়েদি তখন চিকিৎসাসেবা বা পানি পেতেন না। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিল, সব বন্দির জন্যই পানির ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গত, কারাগারে সরবরাহ করা পানির অবস্থা দেশের বাকি অংশের পানির মতই যা কিনা সাধারণত সরাসরি পানযোগ্য থাকে না।

বিভিন্ন কারাগারের মধ্যে, এমনকী একই কারাগারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবস্থার বিস্তর ফারাক দেখা গিয়েছে। কারা কর্তৃপক্ষ কিছু কয়েদিকে এমন জায়গায় রাখে যেখানে খুব গরম, বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা নেই এবং ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি লোক থাকে। কারা আইন অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ 'ভিআইপি' বিবেচিত বন্দিদের 'এ ডিভিশন' দিতে পারে। সেখানে দেওয়া খাদ্য ও থাকার পরিবেশ উন্নততর। 'এ' ডিভিশনপ্রাপ্ত বন্দিরা সাধারণ কয়েদিদের তুলনায় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করার বেশি সুযোগ পান। এছাড়া সেলের ভেতরে তাদের সহায়তার জন্য ভিআইপি নন , এমন একজন বন্দিকে সঙ্গে দেওয়া হয়।

আইনে শিশুকিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদিদের থেকে আলাদা রাখার বিধান থাকলেও কারা কর্তৃপক্ষ বহু শিশুকিশোরকে প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে রেখেছে। আইন এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও কখনো কখনো শিশুদের (অনেক সময় তাদের মায়ের সঙ্গে) কারাগারে রাখা হয়।

কারা কর্তৃপক্ষ সবসময়ই নারী কয়েদিদের পুরুষ কয়েদিদের থেকে আলাদা জায়গায় রাখে। আইন অনুযায়ী 'সেফ কাস্টডি'তে থাকা নারীদের (সাধারণত ধর্ষণ, পাচার ও পারিবারিক সহিংসতার শিকার নারীরা) অপরাধীদের কাছাকাছি রাখা নিষেধ। কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষ সব সময় তাঁদের আলাদা রাখেননি। নারীদের এই 'সেফ কাস্টডি' বা নিরাপত্তা হেফাজত থেকে বের হতে হলে বাধ্যতামূলকভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মানসিক ভারসাম্যহীন কয়েদিদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকলেও সব আটককেন্দ্রে এ ধরনের ব্যবস্থা নেই। আইনেও তার বাধ্যবাধকতা নেই। মানবিক দিক বিবেচনা করে বিচারকেরা প্রতিবন্ধীদের সাজা কমিয়েও দিতে পারেন। আবার কারাধ্যক্ষরাও চাইলে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারেন। যেমন, তাঁরা এ ধরনের কয়েদিদের কারাগার থেকে কারা হাসপাতালে পাঠাতে পারেন।

<u>কারা প্রশাসন:</u> বাংলাদেশের কারাগারে কোনো ন্যায়পাল নেই যাঁর কাছে কয়েদিরা নালিশ জানাতে পারে। কারা কর্তৃপক্ষ বলেছে, তাদের জনবলের উল্লেখযোগ্যরকম ঘাটতি আছে। কয়েদিদের নতুন দক্ষতার প্রশিক্ষণদান ও সংশোধন কর্মসূচির আওতা ছিল নিতান্তই সীমিত।

<u>নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ:</u> কারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে সরকার সরকারি পরিদর্শক ও সরকারপন্থী বেসরকারি পর্যবেক্ষকদের অনুমতি দিয়েছে। তবে এসব পরিদর্শনের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়নি।

ঘ. যথেচ্ছ গ্রেপ্তার অথবা আটক থেকে সুরক্ষা:

বাংলাদেশের সংবিধান কাউকে যথেচ্ছভাবে আটক বা গ্রেপ্তার করার অনুমোদন দেয় না। তবে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুযায়ী সরকার কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তা ও জনশৃঙ্খলার জন্য হুমকি বলে বিবেচনা করলে তাঁকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই আটক করতে পারে। যথেচ্ছ ধরপাকড়ের যৌক্তিকতা দেখাতে আইনপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রায়শই এই আইনের আশ্রয় নিয়েছে। সংবিধান মতে, যে কোনো ব্যক্তি তাঁর আটক বা গ্রেপ্তারের বিষয়টির বৈধতা আদালতে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। তবে সাধারণভাবে সরকারের দিক থেকে এই আইনি শর্ত তেমন মানা হয়নি। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে, শুধুমাত্র সন্দেহভাজন জঙ্গিই নয়, সুশীল সমাজ ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও সরকারের তরফ থেকে গুমের শিকার হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ অনেক সময় কোন ব্যক্তিকে আটক করার পর পরিবারের সদস্য বা আইনজীবীদের তাদের অবস্থান বা ভালোমন্দের কথা জানায় না। অনেক সময় তাঁদের আটক করার কথাই স্বীকার করা হয় না।

<u>পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা:</u>

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পুলিশ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। পুলিশ বিভাগে অনেকগুলো ইউনিট আছে যাদের দায়িত্ব অনেক সময় মিলে যায়। এসব ইউনিটের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্র্যান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)।

সেনাবাহিনী সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে (যিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বেও আছেন) তাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করে এবং তারা দেশরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। সরকার মনে করলে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা কাজে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করতেও সেনাবাহিনীকে 'মাঠে নামাতে' পারে। এর মধ্যে আছে সন্ত্রাস মোকাবিলার কাজ।

দ্য ডাইরেক্টরেট জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স (ডিজিএফআই) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই) এ দুটি হচ্ছে প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা। তাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব অনেক সময় একে অপরের সাথে মিলে যায়। এই দুটি সংস্থা অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি উভয় বিষয়ে কাজ করে এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করে। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ডিজিএফআই এবং (কিছুটা কম মাত্রায়) এনএসআই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানবাধিকার লঙ্ঘনে জড়িয়ে পড়েছে। এরা যাদের মানবাধিকার লংঘন করছে বলে অভিযোগ তারা হচ্ছে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী, বিরোধীদল ও সুশীল সমাজের সদস্য এবং অন্যরা।

বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বাহিনী এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্নীতিতে জড়ালে তার তদন্ত করে অপরাধীকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা সরকারের হাতে থাকলেও তা নিয়মিতভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। এ বছরও সরকার পুলিশের পেশাদারি, শৃঙ্খলা, প্রশিক্ষণ এবং সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো আগের চেয়ে উন্নত করা এবং দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। কমিউনিটিভিত্তিক পুলিশিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগের অংশ হিসেবে পুলিশের মৌলিক প্রশিক্ষণে যথাযথ মাত্রায় শক্তিপ্রয়োগ সংক্রান্ত ধারা অনুসরণ করা অব্যাহত ছিল।

পুলিশের নীতি অনুযায়ী, পুলিশ সদস্যদের বলপ্রয়োগের বড় ধরনের ঘটনায় (বড় ধরনের জখম বা মৃত্যু হওয়ার ঘটনাসহ) স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিভাগীয় তদন্ত হয়। সাধারণত পেশাগত মানের ওপর নজরদারি করা একটি ইউনিট এটি করে যারা সরাসরি পুলিশের মহাপরিদর্শকের (আইজিপি) কাছে রিপোর্ট করে। সরকার এ বছর নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর হাতে মোট কতজন নিহত হয়েছে তার কোনো হিসাব যেমন প্রকাশ করেনি, তেমনি এ ধরনের ঘটনাগুলো তদন্ত করতে সমন্বিত কোনো পদক্ষেপও নেয়নি। এ ধরনের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পুলিশের নজরদারি ইউনিটগুলো কতটুকু স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সংশয় প্রকাশ করেছে। যে গুটিকয়েক ক্ষেত্রে সরকার পুলিশের কাউকে অভিযুক্ত করেছে বলে জানা গেছে, সেসব ক্ষেত্রেও অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পর তাঁদের শুধুমাত্র প্রশাসনিক সাজা দেওয়া হয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সাজা হওয়ার কোনো রকম ঝুঁকি ছাড়াই ক্ষমতার অপব্যবহার অব্যাহত রেখেছে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থার ভয়ে বাদীরা পুলিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করতে চায় না। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার ক্ষেত্রে অনীহাও দায়মুক্তির পরিবেশকে জোরদার করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক থাকা কর্মকর্তাদের বসানো হয়েছে।

র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে ওঠা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করতে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারনাল এনকোয়ারি সেল' এর বিষয়ে সরকারের সমর্থন অব্যাহত ছিল। তবে এই সেল তদন্ত করে কী জেনেছে তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেনি। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী সদস্যদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন ব্যবস্থার কথাও জানানো হয়নি।

নিরাপত্তা বাহিনীগুলো সামাজিক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। (সেকশন ৬ দেখুন)

<u>গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া ও আটক ব্যক্তিদের সঙ্গে আচরণ:</u>

সংবিধানসম্মতভাবে কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করতে হলে আদালতের পরোয়ানা দরকার হয় অথবা অভিযুক্ত লোকটি অচিরেই কোনো অপরাধ করতে যাচ্ছে বলে দেখাতে হয়। কিন্তু ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন নাগরিকের এই রক্ষাকবচের ক্ষেত্রে বড় ব্যতিক্রম করার সুযোগ করে দিয়েছে।

সংবিধান অনুসারে কাউকে আটক করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে একজন বিচারিক কর্মকর্তার সামনে হাজির করতে হবে। কিন্তু সংবিধানের এই বিধান সবসময় ঠিকমতো অনুসরণ করা হয়নি। জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে এমন কাজ প্রতিহত করার লক্ষ্যে সরকার কিংবা একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোনো ব্যক্তিকে ৩০ দিন পর্যন্ত আটক রাখার আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোনো ধরনের জবাবদিহি ছাড়াই কর্তৃপক্ষ অনেক সময় মানুষকে এর চেয়ে বেশি দিন আটকে রেখেছে।

দেশে একটি কার্যকর জামিন ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে। কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো প্রায়শই আদালত থেকে জামিন পাওয়া আসামিদের নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে দীর্ঘদিন আটক রাখছে। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ২০১৬ সালে এক আদেশে জামিনে মুক্তি পাওয়া আসামিকে আবার আদালতে হাজির না করে গ্রেপ্তার দেখানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু এর পরও জামিন পাওয়া আসামিকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার করা বন্ধ হয়নি।

কর্তৃপক্ষ আসামির সঙ্গে তাঁর আইনজীবীকে সাধারণত আদালতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দায়েরের পরই কেবল সাক্ষাৎ করতে দিয়েছে। এ বিষয়টি অনেক সময় ঘটে আসামি আটক হওয়ার কয়েক সপ্তাহ, এমনকি কয়েক মাস পরে। কোনো আসামির যদি আইনজীবী নিয়োগের সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাঁকে সে বিষয়ে সহায়তা করা আইন অনুযায়ী সরকারের দায়িত্ব। কিন্তু এ দেশে এ ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই।

<u>যথেচ্ছ গ্রেপ্তার:</u> অনেক সময় রাজনৈতিক বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে রাখতে অথবা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা মোকাবিলার অংশ হিসেবে কর্তৃপক্ষ অনেককে যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করেছে। সরকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অনেককে আটক রেখেছে। অনেক সময় অন্য সন্দেহভাজনদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করার জন্যও অনেককে আটক করা হয়। ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের সুবিস্তৃত আওতা অনেক সময়ই সাধারণভাবে যথেচ্ছ বলে বিবেচিত গ্রেপ্তারকেও আইনি বৈধতা দেয়। কারণ ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে এমন অপরাধেই কেবল কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে- এমন শর্ত শিথিল করে এ বিশেষ আইনটি। এ বছর বিরোধী দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের গ্রেপ্তার করার ঘটনা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। 'ঢাকা ট্রিবিউন' পত্রিকাকে বিএনপির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ৪৪২৯টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় মোট ৪,৩৪, ৯৭৫টি ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ বছর আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কমপক্ষে একশজন ছাত্রকেও আটক করে। তাদের বেশিরভাগই কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিলেন।

জুলাই ও আগস্ট মাসে সড়ক নিরাপত্তার দাবিতে বিক্ষোভ করার অভিযোগে ঢাকার ডিবি কর্মকর্তারা ৫ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ছাত্রাবাসগুলোতে অভিযান চালিয়ে বহু ছাত্রকে আটক করেন। পরে কিছু ছাত্রকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ১২ জনকে বিচারকের সামনে হাজির করার আগে বেশ কয়েক দিন আটক রাখা হয়। ডিবি তাদের আটক করার কথা প্রথমে অস্বীকার করায় এবং আইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির না করায় মানবাধিকার কর্মীরা সমালোচনা করেন। মুক্তি পাওয়া কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছেন, আটক করার পর তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়।

১১ সেপ্টেম্বর 'ডেইলি স্টার' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পুলিশের আনা কথিত ভুয়া অভিযোগের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। ওই তালিকা অনুযায়ী, হাসপাতালে শয্যাশায়ী ৮২ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ, কথিত ঘটনার দিন দেশের বাইরে থাকা এক ব্যক্তি ও উল্লেখিত অপরাধ সংঘটনের বছরদুয়েক আগে মারা যাওয়া এক ব্যক্তিও মামলার আসামি ছিলেন। ৭ নভেম্বর বিএনপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাদের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ১০৪৬টি 'কাল্পনিক মামলার' একটি আংশিক তালিকা পেশ করে।

পুলিশ নিয়মিতভাবে বিরোধীদলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিজের বাড়ি, জনসমাগমের স্থান কিংবা দলীয় কর্মসূচিতে যাওয়া বা সেখান থেকে ফেরার পথে আটক করেছে। ১০ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভাষ্য অনুযায়ী, বিএনপির কারাবন্দি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন থেকে ফেরার পথে বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থককে পুলিশ আটক করে।

<u>বিচারপূর্ব আটকাবস্থা:</u>

আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা, সম্পদের স্বল্পতা, বিচারপূর্ব বিধিবিধান পালনে শৈথিল্য এবং দুর্নীতির কারণে যথেচ্ছ ও প্রলম্বিত বিচারপূর্ব আটকাবস্থা অব্যাহত ছিল। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের যে সাজা হয়েছে আসামি বিচারের আগেই তার সমান বা বেশি দিন আটক ছিলেন।

২০১৬ সালে হোলি আর্টিজান বেকারিতে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় (যাতে ২০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিল) আটক হওয়া ব্রিটিশ নাগরিক হাসনাত করিমকে দীর্ঘদিন পর গত জুলাইতে মুক্তি দেওয়া হয়। হাসনাত করিমকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই আটক করা হয় এবং তদন্ত চলাকালীন দুই বছরের বেশি সময় ধরে তাকে জামিন দেওয়া হয়নি। সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাওয়ায় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হাসনাত করিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনার সিদ্ধান্ত নেয়।

আটক ব্যক্তির আদালতে আটকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার সক্ষমতা: বিশেষ ক্ষমতা আইন অনুসারে একজন হাকিমকে অবশ্যই ১৫ দিনের মধ্যে আটককৃত লোককে তাকে আটক করার সুনির্দিষ্ট কারণ জানাতে হবে। আইন অনুযায়ী, আটকের মেয়াদ চার মাসের বেশি হলে সরকার নিযুক্ত একটি উপদেষ্টা পরিষদ মামলাটি যাচাই করে দেখবে। আটক ব্যক্তির আটকাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করারও অধিকার আছে।

আটকের মামলাগুলো আইনিভাবে মোকাবিলা করার পথে বিচারিক শূন্যতা একটি বড় বাধা। ২০০৭ সালে 'ডেইলি স্টার' এক প্রতিবেদনে বলেছিল, বিচারক নিয়োগে বিলম্ব হওয়ার কারণে বিচারিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে যা মামলাজট সৃষ্টিতে ভ'মিকা রাখে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ৫০টি জেলা জজসহ নিম্ন আদালতের প্রায় চার শ বিচারকের পদ শূন্য ছিল। ১৬ জানুয়ারি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সংসদকে জানান, ২০১৭ সালের শেষদিন পর্যন্ত ৩৩ লাখ ৯ হাজার ৭৮৯টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল।

৩১ মে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১৮ জন অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ দেওয়ায় হাইকোর্টে বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে মোট ৯৮ জনে দাঁড়ায়। সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সেপ্টেম্বরে ১১ সদস্যবিশিষ্ট বেঞ্চে চারজন বিচারপতি নিয়োগ করে।

ঙ. প্রকাশ্য সুষ্ঠু বিচারে অস্বীকৃতি থেকে সুরক্ষা

বিদ্যমান আইন স্বাধীন বিচার বিভাগের নিশ্চয়তা দিয়েছে। কিন্তু দুর্নীতি ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ সেই স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করেছে। ২০১৪ সালে সংসদে ষোড়শ সংশোধনী পাশ হয়। এর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হয়। ২০১৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট ওই সংশোধনী অসাংবিধানিক বলে রায় দেন। এর পরিণতিতে পার্লামেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত হয় তার জেরে প্রধান বিচারপতি এস. কে. সিনহাকে পদত্যাগ ও শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর বিবিসি বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিনহা দাবি করেন, ওই রায় দেওয়ার পর তাঁকে কার্যত গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল এবং পরে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাঁকে জোর করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। আগস্টে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে সিনহা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও আইনমন্ত্রী তাঁকে সরকারের পক্ষে রায় দেওয়ার

জন্য চাপ দিয়েছিলেন। ওই রায় রিভিউ করার জন্য সরকারের করা পিটিশন আপিল বিভাগে অপেক্ষমান ছিল। বছরের শেষ পর্যন্ত সরকার সিনহার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে। সংবাদ পর্যবেক্ষক এবং রাজনৈতিক ভাষ্যকাররা অভিযোগ করেছেন,এসব অভিযোগ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

৩ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ সরকারের তৈরি করা নিম্ন আদালতের বিচারকদের শৃঙ্খলাবিধির একটি খসড়া গ্রহণ করেন এবং এর মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগ ও সরকারের মধ্যে চলা দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনের অবসান হয়। সুপ্রিম কোর্ট দাবি করেন, ওই বিধিমালা সুপ্রিম কোর্টের শ্রেষ্ঠত্বকে খাটো করেনি এবং সর্বোচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের ওপর থেকে তার নিয়ন্ত্রণ হারাননি। কিন্তু কয়েকজন জ্যেষ্ঠ আইনজ্ঞ তাদের ব্যাখ্যায় বলেন, এর মাধ্যমে নিম্ন আদালত সরকারের নির্বাহী বিভাগের অধীনস্থ বিবেচিত হবে। ২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ২০১৭ সালের অক্টোবর থেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আবদুল ওয়াহাব মিয়ার জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন। এরপর ওয়াহাব মিয়া 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন।

৪ সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রণালয় খালেদা জিয়ার ফৌজদারি মামলার কার্যক্রম প্রকাশ্য আদালত থেকে কারাগারের ভেতরে একটি সংরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নেয়। এই স্থানান্তরের কারণ হিসেবে আইন মন্ত্রণালয় নিরাপত্তার কথা বলেছিল। খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের অনুপস্থিতিতেই ৫ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী কার্যক্রম চলে। সেদিনই প্রকাশ্য আদালত থেকে বিচারকাজ সরিয়ে নেওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আপিল করা হয়। উচ্চ আদালত এ আপিল খারিজ করে দেন।

খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন নিষ্পত্তি বিলম্বিত করতে 'আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার' জন্য ৬ জুন হাইকোর্টের একটি প্যানেল ঢাকার একটি মহানগর হাকিম আদালতকে ভর্ৎসনা করেন।

মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের মতে, হাকিম, অ্যাটর্নি ও আদালতের অন্যান্য কর্মকর্তা বিভিন্ন মামলায় আসামিপক্ষের কাছে ঘুষ চেয়েছেন। অন্যথায় তারা রাজনৈতিক প্রভাব বা আনুগত্যের ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন। পর্যবেক্ষকরা দাবি করেছেন, কোনো বিচারক সরকারের প্রতিকূলে যায় এমন কোনো রায় দিলে বদলির হুমকিতে পড়েন। কর্মকর্তারা কোনো কোনো মামলায় আসামিদের পক্ষে লড়ার ব্যাপারে আইনজীবীদের নিরুৎসাহিত করেছেন।

দুর্নীতি এবং বিশাল মামলাজট আদালত ব্যবস্থাকে বিঘœত করেছে। ক্রমাগত সময় বর্ধিত করা বহু আসামির ন্যায়বিচার পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

<u>বিচার প্রক্রিয়া</u>

সংবিধানে ন্যায্য ও প্রকাশ্য বিচারের অধিকারের কথা বলা হলেও দুর্নীতি, দলীয় পক্ষপাত এবং দুর্বল মানবসম্পদের কারণে বিচার বিভাগ সবসময় এই অধিকারের সুরক্ষা দেয়নি।

বিবাদীকে নিরপরাধ গণ্য করা হয়, তার আপিল করার অধিকার থাকে এবং নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে দ্রুত এবং বিশদভাবে অবহিত হওয়ার অধিকার তার আছে। প্রকাশ্য বিচারে উপস্থিত থাকার অধিকার অভিযুক্তদের আছে। দরিদ্র বিবাদীর একজন সরকারি আইনজীবী পাওয়ার অধিকার আছে। বিচারকাজ পরিচালিত হয় বাংলা ভাষায়। যারা বাংলা বোঝে না বা বলতে পারে না, সরকার তাদের জন্য বিনামূল্যে দোভাষী দেয় না। বিবাদীরা তাদের পক্ষ সমর্থনে যুক্তি সাজাতে পর্যাপ্ত সময় পাওয়ার অধিকার রাখে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি যুক্তি উপস্থাপন বা বাদীপক্ষের সাক্ষী নিয়ে আপত্তি জানানো এবং নিজের সাক্ষী ও সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনের অধিকার রাখে। চাপের মুখে দোষ স্বীকার বা জবানবন্দি না দেওয়ার অধিকারও তাদের আছে, যদিও যেসব বাদী দোষ স্বীকার করে না, প্রায়শই তাদের পুলিশের জিম্মায় রাখা হয়। সরকার প্রায়শ এসব অধিকার আমলে নেয়নি।

নির্বাহী হাকিমদের নেতৃত্বাধীন ভ্রাম্যমাণ আদালতগুলো তাৎক্ষণিক রায় দেয়, যার মধ্যে কারাদণ্ডও থাকে, যেখানে বিবাদীরা আইনি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাননি। বিভিন্ন জেলার ডিসিরা নির্বাহী হাকিমদের বিচারিক ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইন, ২০০৯ সংশোধন ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ নিতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। বছরের শেষ পর্যন্ত সংসদে এ ধরনের আইনের প্রস্তাব আসেনি। ২০১৭ সালে হাইকোর্ট এই মর্মে আদেশ দেন যে, নির্বাহী হাকিমদের হাতে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান "বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি সরাসরি আঘাত এবং এতে ক্ষমতার বণ্টনের তত্ত্ব লংঘিত হয়।" এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে সরকার আপিল করেছে। আদালত রায়টি স্থগিত করে আপিল বিভাগের পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত ভ্রাম্যমাণ আদালতকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দিয়েছে।

রাজনৈতিক কয়েদি ও হাজতি

রাজনৈতিক কয়েদি ও হাজতির উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে। বিরোধী দলগুলোর সদস্যদের গ্রেপ্তার ও বিচারের ক্ষেত্রে প্রায়শ রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিবেচিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যার মধ্যে আছে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টির অজুহাতে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের। বিরোধী দল বিএনপির দাবি, বছর জুড়ে তাদের হাজার হাজার সদস্যকে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে, গত ৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক ও দেশীয় আইনজ্ঞরা এই রায়ের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণের অপর্যাপ্ততা নিয়ে মন্তব্য করেছেন, আভাস দিয়েছেন এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে বিরোধীদলীয় নেত্রীকে অপসারণের রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে। তার পক্ষে জামিন আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে আদালতগুলো সাধারণভাবে বিলম্ব দেখিয়েছে। একই পরিস্থিতিতে দণ্ডিত অপর কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে তাৎক্ষণিক জামিন শুনানির সুযোগ পেতেন। খালেদা জিয়ার ক্ষেত্রে জামিন শুনানি প্রায় এক মাস ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ১২ মার্চ যখন হাইকোর্ট জামিন দেন, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ তাৎক্ষণিকভাবে দুই মাসের জন্য তা স্থগিত করে। রায়ের প্রায় তিন মাস পর যখন জামিন আদেশ নিশ্চিত হয়, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সরকার অন্যান্য মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির ব্যবস্থা করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে, খালেদা জিয়ার রায়ের আগের আট দিনে বিএনপির ১,৭৮৬ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে বিএনপির একজন মুখপাত্র বলেছেন, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্যরাসহ হাজার হাজার লোককে আটক করা হয়েছে। এসব সংখ্যা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

দেওয়ানি বিচারিক প্রক্রিয়া এবং এর প্রতিকার

মানবাধিকার লংঘনের ঘটনায় ব্যক্তি ও সংগঠন বিচারিক প্রতিকার চাইতে পারে। তবে আদালতের প্রতি জনগণের আস্থার অভাবের কারণে অনেকে অভিযোগ দায়ের করা থেকে বিরত থাকেন। আইনে একজন ন্যায়পালের কথা বলা থাকলেও এখনও কোনো ন্যায়পাল নিযুক্ত করা হয়নি।

সম্পত্তি প্রত্যর্পণ

হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে (মূলত) সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত করতে সরকার ২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি (প্রত্যর্পণ) আইন বাস্তবায়ন করেনি (দেখুন সেকশন ২ এর ঘ)। অর্পিত সম্পত্তি আইন সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রের শত্রু বলে ঘোষিত যে কারো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার এক্তিয়ার সরকারকে দেয়। কোনো সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকজন দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলে, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময়, এই আইন অনেক সময় সম্পত্তির দখল নিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনও ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধের কথা বলে আসছে, যাতে সংখ্যালঘুরা সামঞ্জস্যহীনভাবে উৎখাত হয়েছে। বিশেষ করে নতুন রাস্তাঘাট ও শিল্প উন্নয়ন অঞ্চলের কাছে যেখানে জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে এগুলো হয়েছে। সংখ্যালঘুরা দাবি করেছে, কখনও কখনও স্থানীয় পুলিশ, নাগরিক কর্তৃপক্ষ, এবং রাজনৈতিক নেতারা উচ্ছেদে জড়িত থেকেছে, অথবা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ভূমি দখলকারীদের বিচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে (দেখুন সেকশন ৬)। ২০১৬ সালে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করে, যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভূমি ফেরতে ভূমিকা রাখতে পারে। এই সংশোধনী এখন পর্যন্ত কোনো বিরোধ নিষ্পত্তি ঘটাতে পারেনি (দেখুন সেকশন ২ এর ঘ)।

চ. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পরিবার, গৃহ বা তথ্য লেনদেনে যথেচ্ছ এবং বেআইনি হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা

দেশের আইন ব্যক্তিগত গোপনীয় যোগাযোগের বিষয়ে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেনি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো ব্যক্তিগত গোপনীয় যোগাযোগে নজরদারি করতে পারে, তবে ব্যক্তিগত গোপনীয় যোগাযোগের ওপর নজরদারি করতে পুলিশ কালেভদ্রে আদালতের অনুমতি নিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে, সরকারের সমালোচনাকারী হিসেবে বিবেচিত নাগরিকদের ওপর নজরদারি চালাতে এবং তাদের গতিবিধি অবহিত করতে বাংলাদেশ পুলিশ, এনএসআই এবং ডিজিএফআই তথ্যদাতা নিযুক্ত করেছে।

জনগণকে ভীতসন্ত্রস্ত করার চেষ্টায় সরকার সামাজিক মাধ্যম সাইট এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যোগাযোগের ওপর নজরদারিতে ক্রমবর্ধমানভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সামাজিক মাধ্যমে “গুজব সনাক্ত” করতে সরকার একটি নজরদারি সেল গঠন করেছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী (তৎকালীন) তারানা হালিম বলেছেন, ইন্টারনেটের যেসব আধেয় (কনটেন্ট) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে হুমকিগ্রস্ত করে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপর্যস্ত করে,অথবা রাষ্ট্রকে বিব্রত করে সেগুলোকে গুজব হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেগুলো বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ রেগুলেটরি কমিশনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সেকশন ২: নাগরিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা, যার মধ্যে আছে:

ক. মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্র যার অন্তর্ভুক্ত

সংবিধানে সংবাদপত্রসহ মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলা আছে, তবে সরকার কখনও কখনও এই অধিকার রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতার তাৎপর্যপূর্ণ সীমাবদ্ধতা দেখা গেছে। হয়রানি ও প্রতিহিংসার ভয়ে কোনো কোনো সাংবাদিক সরকারের প্রতি সমালোচনার ক্ষেত্রে আত্ম-সংবরণ করেছেন।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা: সংবিধানের সমালোচনাকে সংবিধানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল করা হয়েছে। রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তি তিন বছরের কারাদণ্ড থেকে আজীবন কারাদণ্ড।

আইনে ঘৃণামূলক বক্তব্যের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে, কিন্তু কোনটি ঘৃণামূলক বক্তব্য বলে গণ্য হবে, তা সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা নেই, যা সরকারকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করার বিস্তৃত ক্ষমতা দেয়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি; বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্টকারী; এবং জনশৃঙ্খলা, শালীনতা, অথবা নৈতিকতার বিরোধী; অথবা আদালত অবমাননার সমতুল্য, মানহানিকর, অথবা অপরাধ সংঘটনে উস্কানিমূলক হিসেবে গণ্য বক্তব্যের ওপর সরকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারে। বৈদেশিক অনুদান আইন সাংবিধানিক সংস্থার প্রতি যে কোনো সমালোচনাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। ২০০৬ সালের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে (আইসিটিএ) ব্যক্তি ও সংগঠনের অবমাননার কথা বলা হয়েছে এবং এ আইন দিয়ে বিরোধী দলীয় ব্যক্তি ও নাগরিক সমাজের ব্যক্তিদের বিচার করা হয়েছে।

নভেম্বর পর্যন্ত দুর্নীতি, সহিংসতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহ সংক্রান্ত বিষয়ে খালেদা জিয়া ৩৬টি মামলার মধ্যে ৩৪টিতে জামিন পেয়েছেন। তাকে কারাগারেই থাকতে হচ্ছে, কারণ আরো দুটি অনিষ্পন্ন মামলায় তিনি জামিন পাননি।

<u>সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা:</u> প্রিন্ট এবং অনলাইন স্বাধীন গণমাধ্যমগুলো সক্রিয় ছিল এবং বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ করেছে; তবে যেসব গণমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করেছে, সেগুলো সরকারের নেতিবাচক চাপের মুখে পড়েছে।

বাংলাদেশের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেলের ওপর সরকার সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ বহাল রেখেছে এবং বেসরকারি চ্যানেলগুলোতে বিনামূল্যে সরকারি কনটেন্ট সম্প্রচার বাধ্যতামূলক করেছে।

নাগরিক সমাজ জানিয়েছে, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ টেলিভিশনের ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে, যেহেতু সরকারের ছাড়পত্র পাওয়া সকল টেলিভিশন চ্যানেল ক্ষমতাসীন দলের সমর্থনকারী।

সহিংসতা ও হয়রানি: কর্তৃপক্ষ, যার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও অন্তর্ভুক্ত, এবং ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠন সাংবাদিকদের ওপর শারীরিক হামলা, হয়রানি এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছে, বিশেষ করে আগস্ট মাসে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে প্রতিবাদের সময় এগুলো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী ও তার বোনের মেয়েকে নিয়ে মন্তব্যকে ঘিরে মানহানির মামলায় আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শেষে ২২ জুলাই 'আমার দেশ'-এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের ওপর শারীরিকভাবে হামলা করা হয়। ঘটনার একটি ধারণকৃত অংশে দেখা যায়, মাহমুদুর রহমান হামলার শিকার হওয়ার সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। বছরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তদন্ত হয়নি।

বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর-ডট-কমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সংবাদ সংগ্রহের সময় গত ৪ আগস্ট ঢাকা কলেজের কাছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোসাংবাদিক এ এম আহাদসহ প্রায় ১২ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। এ এম আহাদ পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়েছেন, হামলাকারীরা তাঁর ক্যামেরা ভেঙে ফেলে। হামলার ঘটনার তদন্তের অনুরোধ জানান তথ্যমন্ত্রী।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) জানিয়েছে, ৫ আগস্ট সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সংবাদ সংগ্রহের সময় শহীদুল আলমসহ ২৩ জন সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। শহীদুল আলম ৪ আগস্ট স্কাইপে আল-জাজিরাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এরপর নিজের ফেসবুক পেজে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার বিবরণ দিচ্ছিলেন।

পরদিন "উস্কানিমূলক মন্তব্য" করার দায়ে শহীদুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৬ আগস্ট শহীদুল আলমকে আদালতে নেওয়া হলে তিনি সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারছিলেন না বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। (দেখুন সেকশন ১ এর গ।)

শহীদুল আলমের বিরুদ্ধে আইসিটিএ-এর অধীনে অভিযোগ আনা হয়, যাতে এমন বিষয় প্রকাশকে অপরাধ হিসেবে আমলযোগ্য করা হয়েছে, যা তার পাঠক-দর্শককে "নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে", "আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়" অথবা "রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়"। জামিন শুনানি একাধিকবার স্থগিত হওয়ার পর হাইকোর্ট শহীদুল আলমের জামিন মঞ্জুর করেন এবং ২০ নভেম্বর তিনি মুক্তি পান। সরকার জামিনের বিরুদ্ধে আপিল করে। ১১ ডিসেম্বর তাঁর বিচার প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়, তবে তা মূলতবি হয়ে ২০১৯ সালে চলে গেছে। স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওগুলো শহীদুল আলমের মামলাকে রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করে।

ঢাকা মহানগর পুলিশের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকার এমন প্রায় ১০০টি সামাজিক মাধ্যম অ্যাকাউন্টের ব্যাপারে বিশদ তথ্য জোগাড় করেছে, যেগুলো সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় উস্কানিমূলক কনটেন্ট ছড়িয়ে সহিংসতা উস্কে দিয়েছে বলে তারা দাবী করেন। এপ্রিল থেকে মে পর্যন্ত কোটা বিরোধী আন্দোলনে অথবা আগস্ট মাসে সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট কতজন গ্রেপ্তার, আটক, মুক্ত বা নিখোঁজ হয়েছেন, তার নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া কঠিন। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম বিভিন্নরকম সংখ্যা দিয়েছে।

আটককৃতদের পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছে, যাতে সরকার স্বীকার করতে উৎসাহিত হয় যে, তাদের পরিবারের সদস্যরা হেফাজতে আটক আছে।

সেন্সরশিপ অথবা কনটেন্টের ওপর নিষেধাজ্ঞা: নিরপেক্ষ সাংবাদিকেরা অভিযোগ করেছেন, আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ রেখে এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করতে চাপ দিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠাগুলোকে প্রভাবিত করেছে। আরএসএফ অভিযোগ করেছে, সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর "প্রাদুর্ভাবসুলভ সহিংসতা" এবং "দায়ীদের প্রায় পরিকল্পিত দায়মুক্তির" কারণে সংবাদমাধ্যমের আত্ম-সেন্সরশিপ বাড়ছে।

বৈচিত্রপূর্ণ মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অবশ্য বেসরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো বরাবর স্বাধীনতা ভোগ করেছে। রাজনৈতিক প্রান্তিকীকরণ ও আত্ম-সেন্সরশিপ সমস্যা থেকে গেছে।

সেপ্টেম্বরে সংসদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) পাস করে। দাবি করা হয়, সাইবার অপরাধ কমানোই এই আইনের উদ্দেশ্য। মানবাধিকার সংগঠন, সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান, এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই আইনের নিন্দা জানিয়ে বলেছে, মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করা এবং স্বাধীন মত প্রকাশকে অপরাধে পরিণত করাই এটির অভিপ্রায়। এই আইনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয় সঙ্গীত, অথবা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে "প্রোপাগান্ডা" ছড়ানোর সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড। আইনটিতে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমিত করা হয়েছে বলে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সমালোচনা করেছে।

যেসব সংবাদমাধ্যম সরকারের সমালোচনা করেছে অথবা বিরোধী দলের কর্মকাণ্ড ও বিবৃতি সম্প্রচার করেছে, সরকার সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে । আগস্টের নিরাপদ সড়ক নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের সময় বিক্ষোভকারীদের সংগঠিত হওয়ার সামর্থ্য সীমিত করতে সরকার ইন্টারনেট সংযোগ

আটকে দিয়েছে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো জানিয়েছে, সরকারি কর্মকর্তারা তাদের সড়কে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ওপর প্রতিবেদন সম্প্রচার না করতে 'বলেছেন'।

কতিপয় সাংবাদিক ও মানবাধিকার এনজিও জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনীর আক্রোশ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার আশঙ্কার কারণে সাংবাদিকেরা আত্ম-সেন্সরশিপে প্রবৃত্ত হন। সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা সর্বত্র এবং সরব হলেও কোনো কোনো গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব সরকারের হয়রানির আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।

কোনো কোনো আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ভিসা পেতে বিলম্ব এবং জটিলতার মুখোমুখি হওয়ার কথা জানিয়েছে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড স্থানীয় ও বিদেশি চলচ্চিত্র পর্যালোচনা করে এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, আইন-শৃঙ্খলা, ধর্মীয় অনুভূতি, অশ্লীলতা, বৈদেশিক সম্পর্ক, মানহানি, অথবা কুম্ভীলকবৃত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে চলচ্চিত্র সেন্সর ও নিষিদ্ধ করার কর্তৃত্ব রাখে। তবে অতীতের চেয়ে এটির কড়াকড়ি কম ছিল।

বেসরকারি প্রভাব: নাস্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ এবং এলজিবিটিআই লেখক ও ব্লগারেরা জানিয়েছেন, সহিংস চরমপন্থি সংগঠনগুলোর কাছ থেকে তাদের হুমকি পাওয়া অব্যাহত ছিল। মে মাসে একজন এলজিবিটিআই অধিকারকর্মী দেশে এলজিবিটিআই গোষ্ঠীকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন, কারণ আনুষ্ঠানিক সংগঠন হতে গেলে এলজিবিটিআই কর্মীদের পরিচয় সরকারের কাছে প্রকাশ করতে হবে, এতে তারা সরকারের নজরদারি ও হয়রানির শিকার হতে পারেন।

<u>ইন্টারনেট স্বাধীনতা</u>

পৃথক পৃথক ঘটনায় সরকার ইন্টারনেটের অভিগম্যতা সীমিত করেছে ও বিঘ্নিত করেছে এবং অনলাইন কনটেন্ট সেন্সর করেছে। সরকার ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এবং ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রোটোকল টেলিফোন নিষিদ্ধ করলেও এই নিষেধাজ্ঞা খুব একটা বলবৎ করেনি।

বিভিন্ন ঘটনায় সরকার ইন্টারনেট যোগাযোগে হস্তক্ষেপ করেছে, অভিগম্যতা ফিল্টার করেছে অথবা আটকে দিয়েছে, কনটেন্ট নিষিদ্ধ করেছে এবং ওয়েবসাইট অথবা অন্যান্য যোগাযোগ সেন্সর করেছে। অস্পষ্ট মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে, অথবা বিরোধী দলের সমর্থন করে এমন অনেক কনটেন্ট আইনের পরিপন্থি বলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে সরকার অনেক ওয়েবসাইট স্থগিত অথবা বন্ধ করে দিয়েছে।

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং সরকারের তরফ থেকে কনটেন্ট আটকে দেওয়া সংক্রান্ত অনুরোধ এরা পালন করে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীদের পদক্ষেপ গ্রহণের আদেশ দেওয়ার মাধ্যমে। সরকার যেসব ইন্টারনেট কনটেন্টকে জাতীয় ঐক্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি ক্ষতিকর হিসেবে গণ্য করে, সেগুলো বিটিআরসি ফিল্টার করেছে। সরকারের সমালোচনাকারী কনটেন্ট প্রকাশ করায় এবং বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন আছে বলে যাদেরকে গণ্য করা হয়েছে, ২০১৬ সালে বিটিআরসি এমন ৩৫টি ওয়েবসাইট আটকে দেওয়ার নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছে। এসব সাইটের অনেকগুলো এখনও আটকানো আছে।

রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনলাইনে আক্রমণাত্মক অথবা অবমাননাকর বক্তব্য পোস্ট করা আইসিটিএ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইনের বিরোধিতাকারীরা বলেছে, এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে অসাংবিধানিকভাবে রূদ্ধ করেছে। সরকার আইসিটিএ এবং মৃত্যুদণ্ডের বিধান সম্বলিত রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ দায়েরের হুমকিকে কাজে লাগিয়ে অনলাইন কর্মকাণ্ড সীমিত করেছে এবং অনলাইনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) পাস হয়েছে ১৯

সেপ্টেম্বর। ১৫ সেপ্টেম্বর টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেন, এই বিল পাসের মধ্য দিয়ে আইসিটিএ-এর ৫৭ ধারা অপসারিত হবে; তবে ৫৭ ধারার অনেক কিছুই চূড়ান্ত ডিএসএ আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থা আর্টিকেল নাইন্টিন জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত আইসিটিএ-এর ৫৭ ধারায় সরকার ৮৭ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

'অধিকার'-এর হিসাব অনুযায়ী, সড়ক নিরাপত্তা বিক্ষোভ আন্দোলনের সময় ফেসবুক ও সামাজিক মাধ্যমে "মিথ্যা" তথ্য প্রদান অথবা "গুজব ছড়ানো", যা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যায় বলে প্রতীয়মান হয়েছে, এসব কারণে আগস্ট মাসে ২২ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইসিটিএ-এর আওতায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

১৮ জুন বিটিআরসি কয়েক ঘণ্টার জন্য বিডিনিউজটোয়েন্টিফোর ওয়েবসাইট আটকে দেয় কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা না দিয়ে। নিরপেক্ষ সাংবাদিকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানটির একটি প্রতিবেদনে সম্প্রতি নিযুক্ত সেনাপ্রধানের ভাইয়ের রাষ্ট্রপতির ক্ষমাপ্রাপ্তি এবং কারামুক্তি সংক্রান্ত একটি অনুচ্ছেদ ছিল। এই অনুচ্ছেদ অপসারণ করা হয় এবং সংবাদপত্র পোর্টালটি পরে আনব্লক করা হয়।

১ জুন কক্সবাজারে বিচারবহির্ভূত হত্যা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর ২ জুন ডেইলি স্টারের ওয়েবসাইট আটকে দেয় বিটিআরসি। ৯ ডিসেম্বর বিটিআরসি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫৮টি সংবাদ পোর্টালের ওয়েবসাইট বন্ধ করে দেয়। (দেখুন সেকশন ১ এর ক।)

২০১৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) জানায়, জনসংখ্যার ১৯ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। বিটিআরসি জানায়, সেপ্টেম্বরে প্রায় ৯ কোটি ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন ছিল, যার মধ্যে ৮ কোটি ৫০ লাখ মোবাইল ইন্টারনেট সাবস্ক্রিপশন (একজন ব্যক্তির একাধিক সাবস্ক্রিপশন থাকতে পারে)।

<u>বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান</u>

বিদ্যায়তনিক স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ওপর সরকার যদিও তেমন একটা বিধিনিষেধ আরোপ করেনি, তবু স্পর্শকাতর ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়, যেগুলো ধর্মীয় অথবা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা উস্কে দিতে পারে, কর্তৃপক্ষ সেগুলোকে নিরুৎসাহিত করেছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত প্রকাশনাগুলোও নজরদারি ও সরকারের অনুমোদনের আওতাধীন করা হয়েছে।

খ. শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা

সরকার শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করেছে।

<u>শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা</u>

শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার আইনে দেওয়া আছে, তবে সরকার এই অধিকার সীমিত করেছে। আইন অনুযায়ী সরকারের চার জনের বেশি মানুষের সমবেত হওয়া নিষিদ্ধ করার এক্তিয়ার আছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) এক আদেশ অনুযায়ী ঢাকায় বিক্ষোভ বা প্রতিবাদের জন্য সমাবেশ ডাকতে হলে আগাম অনুমতি নিতে হয়।

মানবাধিকার এনজিওগুলোর দেওয়া তথ্যমতে, কর্তৃপক্ষ অনুমতি নেওয়ার এই বিধানকে বিরোধী গ্রুপগুলোকে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখার কাজে ব্যবহার করা অব্যাহত রেখেছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে মাঝে মাঝে পুলিশ অথবা ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা শক্তি প্রয়োগ করেছে।

বছর জুড়ে সমাবেশ ও বিক্ষোভ আয়োজনে বিএনপিকে বাধা দিয়েছে সরকার। রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য নির্ধারিত গুটিকয়েক বড় জায়গার অন্যতম সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১১, ১৯ ও ২৯ মার্চ সমাবেশ করার ব্যাপারে বিএনপির আবেদন 'নিরাপত্তার কারণে' নাকচ করা হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত দলটিকে অন্য একটি জায়গায় সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

পৃথক আরেকটি দৃষ্টান্তে, বিএনপি দাবি করে, তারা ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় তাদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশ করা এবং ১০ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করার মৌখিক অনুমতি পেয়েছে। তবে ওই দুই অনুষ্ঠানে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে।

বিএনপি জানিয়েছে, সেপ্টেম্বরের প্রথম তিন দিন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ৩০৪ জন নেতাকর্মীকে আটক করেছে এবং ওই মাসে আরো পরে মানববন্ধনের সময় প্রায় ২০০ নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সদরদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক বিরোধী দলীয় কর্মীদের আটকে কোনো অভিযান চালানোর তথ্য অস্বীকার করেছেন।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ (এএল) এবং তার জোটের দলগুলোকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ও তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্থানে সারাবছর সমাবেশ করতে দেওয়া হয়েছে।

১৫ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা বলেন, সোহরাওয়াদী উদ্যানে রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাবেশ করতে দিতে তিনি ডিএমপি কমিশনারকে নির্দেশ দেবেন। প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৯ সেপ্টেম্বর ডিএমপি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিএনপিকে সমাবেশ করতে দেওয়ার অনুমতি দেয় ২২টি শর্তে, যার মধ্যে ছিল তারা নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেরাই করবে এবং সমাবেশস্থলে ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি) ক্যামেরা স্থাপন করবে। সেইসঙ্গে ডিএমপি "জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড; লাঠি বহন; ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয় এমন বক্তৃতা এবং মিছিল করে সমাবেশে আসা নিষিদ্ধ করে।"

এ বছর পুলিশ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে শক্তিপ্রয়োগ করেছে। ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৪ মার্চ মিছিল করে ঢাকার সচিবালয় অভিমুখে যেতে থাকা প্রায় ১০০০ বিক্ষোভকারীকে পুলিশ লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এতে ১৫ জন বিক্ষোভকারী আহত হন। বিক্ষোভকারীরা সচিবালয়ের সামনে পূর্বনির্ধারিত অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাচ্ছিল। সহিংস এই ছত্রভঙ্গের ঘটনার পর ডিএমপির এক মুখপাত্র সরকারের কর্মকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, বিক্ষোভকারীরা যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করছিল।

শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সরকারের আনুষ্ঠানিক বাধা সৃষ্টি এবং পুলিশের প্রতিবন্ধকতার বাইরে এমন তথ্য পাওয়া গেছে যে, যেসব জায়গায় শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে সরকার ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রকর্মীদের নিযুক্ত করেছে। ৪ আগস্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (বিসিএল) কর্মীরা ধানমন্ডিতে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি, পাথর ও পিস্তল নিয়ে একদল শিক্ষার্থীর ওপর হামলা চালায়। এই পদক্ষেপে ১৫০ জন আহত হয় বলে পত্রপত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। অনেক সংবাদমাধ্যম প্রতিবেদনে বলেছে, পুলিশ হামলাকারীদের প্রতিহত বা নিবৃত্ত করেনি। নিরাপদ সড়ক আন্দোলন প্রকাশ্যে সমর্থনকারী বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী ও সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

<u>সভা-সমিতি করার স্বাধীনতা</u>

জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে "যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ" সাপেক্ষে আইন নাগরিকদের সমিতি গঠনের অধিকার দেয়। সরকার সাধারণভাবে এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সরকারের এনজিও ব্যুরো মাঝে মাঝে

সেইসব এনজিওর বৈদেশিক তহবিল অনুমোদন স্থগিত রেখেছে, যেগুলোর কর্মক্ষেত্র সরকার স্পর্শকাতর বলে মনে করে, যেমন মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, আদিবাসীদের অধিকার অথবা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রতি মানবিক সহায়তা (দেখুন সেকশন ২ এর ঘ এবং ৭ এর ক)।

২০১৬ সালের বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন এনজিও অথবা সরকারি কর্মকর্তাদের বিদেশি তহবিল গ্রহণের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এতে সংবিধান অথবা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে এনজিওগুলোর "অবমাননাকর"মন্তব্য শাস্তিযোগ্য করা হয়েছে (দেখুন সেকশন ৫)। ২০১৭ সালের অক্টোবরে সরকার ঘোষণা করে, মুসলিম এইড বাংলাদেশ, ইসলামিক রিলিফ এবং আল্লামা ফজলুল্লাহ ফাউন্ডেশনসহ কয়েকটি এনজিওকে কক্সবাজারে আর কর্মকাণ্ড পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হবে না। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বছরজুড়ে তিনটি সংগঠনের কক্সবাজারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা নিষিদ্ধ ছিল।

গ. ধর্মের স্বাধীনতা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন দেখুন www.state.gov/religiousfreedomreport -এ।

ঘ. চলাফেরার স্বাধীনতা

আইনে অভ্যন্তরীণ চলাফেরা, বিদেশ সফর, অভিবাসন ও প্রত্যাবাসনের স্বাধীনতা দেওয়া আছে এবং সরকার সাধারণভাবে এইসব অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আছে- পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার। সরকার বিদেশিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের ওপর কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে বার্মায় সহিংসতার হাত থেকে বাঁচতে ৭ লাখের বেশি ব্যক্তি, অধিকাংশই রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পালিয়ে এসেছে, যেটিকে নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বার্মার সামরিক বাহিনীর পরিকল্পিত জাতিগত শুদ্ধি অভিযান হিসেবে সনাক্ত করেছেন। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মোট রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ, যারা শরণার্থী শিবিরসমুহ ও কক্সবাজারের বার্মা সীমান্তে আশ্রয়দাতা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বসবাস করছে। সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, যদিও চিকিৎসার জন্য ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকার কক্সবাজার শহরে প্রবেশের সুযোগ দেয়।

অভিবাসী, শরণার্থী, এবং রাষ্ট্রহীন ব্যক্তিদের ওপর অন্যায়-অবিচার: ২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা শরণার্থীর ঢল নামার আগে ইউএনএইচসিআর শরণার্থী শিবিরে ৬৬ জনের যৌন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার শিকার হওয়ার তথ্য জানিয়েছে, যাদেরকে মার্চ মাস জুড়ে মানসিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অক্টোবরে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জানায়, তারা ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় ১০০টি মানব পাচারের ঘটনা সনাক্ত করেছে, যাদের অধিকাংশই শ্রম পাচারের শিকার।

<u>অভ্যন্তরীণ চলাফেরা:</u> সরকার ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশন এবং ১৯৬৭ সালের প্রটোকলের পক্ষ নয়। ফলে বাংলাদেশ সরকার দাবি করে, এই দলিলে যেসব মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছে, তারা সেগুলো রক্ষা করতে আইনগতভাবে বাধ্য নয়।

সরকার নতুন আসা রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না, তাদেরকে বলে থাকে "জোরপূর্বক উৎখাত হওয়া মিয়ানমারের নাগরিক"। বাস্তবে সরকার শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত মানদণ্ডের অনেকগুলোই অনুসরণ করে চলে। একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলো রোহিঙ্গাদের সারা বাংলাদেশে চলাফেরার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। রোহিঙ্গারা উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় মোটামুটি অবাধে চলাফেরা করতে পারলেও তাদের ওই এলাকার বাইরে আসা প্রতিরোধে সরকার টহল চৌকি বসিয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মাঝে মাঝে দেশের বিভিন্ন স্থানে চলাফেরা করতে দেওয়া হয়নি, অথবা তারা সেটা করতে গেলে হয়রানি ও আটকের শিকার হয়েছেন।

এ বছর সিনিয়র বিএনপি নেতা ও সাবেক আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমদকে দু দফায় নোয়াখালীতে তার বাসায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মওদুদ আহমদ দাবি করেছেন, পুলিশ তাকে তাঁর বাসায় আবদ্ধ করে রেখেছে, তাকে সমর্থক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং দল সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি। মওদুদ অভিযোগ করেন, ওই এলাকায় তাঁর নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্ব^ী ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের মদদে পুলিশ তার চলাফেরার স্বাধীনতা সীমিত করেছে। পুলিশ দাবি করেছে, জ্যেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে মওদুদ আহমদের বাসার নিরাপত্তা জোরদার করতেই এইসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

<u>বিদেশ সফর:</u> কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ বিরোধী নেতা তাদের পাসপোর্ট নবায়নে ব্যাপক বিলম্বের কথা জানিয়েছেন; অন্যান্যরা দেশ ত্যাগের সময় বিমানবন্দরে হয়রানি ও বিলম্ব করানোর কথা বলেছেন। ১২ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র দিতে বিলম্ব করে।

সরকার ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের দেশত্যাগ প্রতিরোধ করে।

সরকারি নীতি অনুযায়ী, দেশের পাসপোর্ট ইসরায়েল সফরের জন্য অকার্যকর।

অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত ব্যক্তি (আইডিপি)

১৯৭৩-৯৭ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাতের কারণে সূত্রপাত ঘটা সরকারি নীতির পরিণামে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামাজিক উত্তেজনা ও আদিবাসী ব্যক্তিদের প্রান্তিকীকরণ অব্যাহত থেকেছে। এই নীতির অধীনে জনসংখ্যাগত ভারসাম্যে পরিবর্তন ঘটিয়ে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার -অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে ভূমিহীন বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি গড়ে দেওয়া হয়, যাতে হাজার হাজার আদিবাসী ব্যক্তি স্থানচ্যুত হয়েছেন ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আইডিপিদের নিরাপত্তা সীমিত থেকেছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতারা মনে করেন, বসতিস্থাপনকারীরা ব্যাপকভাবে আদিবাসী ব্যক্তিদের অধিকার হরণ করেছেন, মাঝে মাঝে নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় এটা হয়েছে।

২০১৬ সালে "পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন" সংশোধন করে সরকার, যার উদ্দেশ্য কমিশনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে এটির চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা খর্ব করা। সংশোধিত এ আইন আলোচ্য বছরে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ গোষ্ঠী নেতারা বিরোধ নিষ্পত্তির শুনানি শুরুর আগে আইনটির জন্য একটি পরিচালন কাঠামো প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে সরকার বিচারপতি মোহাম্মদ আনোয়ারুল হককে তিন বছরের জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেয়। আইন বাস্তবায়নে আইন মন্ত্রণালয় বিধিমালা তৈরি করেছে, তবে এটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আইডিপির সংখ্যা এখনও বিতর্কিত। ২০০০ সালে সরকারের একটি টাস্ক ফোর্স হিসাব করে বলেছিল সংখ্যাটি ৫ লাখ, যার মধ্যে আদিবাসীদের পাশাপাশি অ-আদিবাসীরাও ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, পার্বত্য চট্টগ্রামে ৯০ হাজারের সামান্য বেশি আদিবাসী আইডিপি বসবাস করছেন। প্রধানমন্ত্রী আইডিপিদের প্রত্যাবর্তনে সহায়তা করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনিষ্পন্ন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি করা এবং অবশিষ্ট সেনা শিবিরগুলো গুটিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তবে বসতি স্থাপনকারীদের আইডিপি হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা নিয়ে বিরোধের কারণে আইডিপি বিষয়ক টাস্ক ফোর্স কার্যকর হতে পারেনি। কমিশন জানিয়েছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনীর শিবির এবং সেনাবাহিনীর বিনোদনমূলক স্থাপনা নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু আদিবাসী পরিবারকে স্থানচ্যুত করেছে।

শরণার্থীদের সুরক্ষা

২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা ঢল শুরুর আগে দুটি স্বীকৃত শিবিরে (কুতুপালঙ এবং নয়াপাড়া) বসবাসকারী বার্মার প্রায় ৩৩,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীর সাময়িক নিরাপত্তা ও মৌলিক সহায়তা দিয়ে আসছিল সরকার ও ইউএনএইচসিআর। এছাড়া সরকার এবং আইওএম কক্সবাজারের বিভিন্ন অস্থায়ী বস্তিতে বসবাসকারী প্রায় ২০০,০০০ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাকে সহায়তা করে আসছিল। ২০১৭ সালের আগস্টে শরণার্থীদের নতুন স্রোত শুরু হওয়ার পর থেকে ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী বিভিন্ন শরণার্থী শিবির, অস্থায়ী বসতি এবং আশ্রয়দাতা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বসবাস করছে। জাতিসংঘের মতে, এই জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বয়স ১৮ বছরের কম। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গঠন করা একটি জাতীয় টাস্ক ফোর্স রোহিঙ্গা সমস্যার সার্বিক সমন্বয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সহায়তা নিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় রোহিঙ্গা বিষয়ে সাড়া প্রদানের দিক সমন্বয় করছে। স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় করছেন শরণার্থী, ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) এবং কক্সবাজার জেলার ডিসি।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে করা এবং রোহিঙ্গাদের নিবন্ধনে সহায়তা করার জন্য ২০১৭ সালের শরৎ মৌসুমে সরকার কক্সবাজার জেলায় বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয়ে অস্থায়ীভাবে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেছিল। ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা উদ্বেগের প্রতি সাড়া দিয়ে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোয় সেনাবাহিনী পুনরায় আরো সক্রিয় হয়েছে, দিনে ২৪ ঘণ্টা টহল দিচ্ছেন তারা। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ও তাদের শিবিরগুলোয় নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি নির্দেশ জারি করেছে। আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো অভিযোগ করেছে, সীমান্তরক্ষী, সেনা এবং পুলিশের কতিপয় কর্মকর্তা রোহিঙ্গা নারী ও শিশু পাচারে সহায়তা করার সঙ্গে জড়িত, এই সহায়তা ঘুষের বিনিময়ে "অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে রাখার"মাধ্যমে পাচারকারীদের রোহিঙ্গা শিবিরে প্রবেশ করতে দেওয়া থেকে শুরু করে সরাসরি সংশ্লিষ্টতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

<u>জোর করে ঝুঁকির মুখে ফেরত পাঠানো</u>: কাউকে জোর করে ঝুঁকির মুখে ফেরত পাঠানো বা জবরদস্তিমূলক প্রত্যাবাসন করা হয়নি। বার্মার অভিযোগ অনুযায়ী বাংলাদেশ যে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরার পথ রুদ্ধ করছে না, তা প্রদর্শন করতে ১৫ নভেম্বর রোহিঙ্গা শিবিরে বাস পাঠানো হয় যাতে কেউ দেশে ফিরতে রাজি থাকলে তাকে তুলে নেওয়া হবে। কোনো শরণার্থী স্বেচ্ছায় এগিয়ে না আসায় বাংলাদেশ এই কর্মসূচি স্থগিত করে দেয়। আলোচ্য বছরে কয়েক দফায় সরকারি কর্মকর্তারা সুস্পষ্ট সম্মতির ভিত্তিতে শরণার্থীদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং সম্মানের সঙ্গে দেশে ফেরার ব্যাপারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

<u>আশ্রয়ের অভিগম্যতা</u>: আইনে আশ্রয় প্রদান বা কাউকে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়ার বিধান নেই। সরকার শরণার্থীদের নিরাপত্তা বিধানের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাও তৈরি করেনি। সরকার দেশে বসবাসকারী

রোহিঙ্গাদের তাৎপর্যপূর্ণ নিরাপত্তা ও সহায়তা দিয়েছে। সরকার ইউএনএইচসিআরের সহযোগিতায় দুটি স্বীকৃত শিবিরে বসবাসকারী নিবন্ধিত শরণার্থীদের সাময়িক নিরাপত্তা ও মৌলিক সহায়তা দিয়েছে। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা আসার পর সরকার নতুন শরণার্থীদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিবন্ধন শুরু করে এবং বার্মার ঠিকানাসহ পরিচয়পত্র দেয়। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যাচাই করা, আগের কার্ডের বদলে আইডি কার্ড ইস্যু এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিরাপত্তা এবং সেবা ও সহায়তার জন্য একটি উত্তম ব্যবস্থা তৈরি করতে সরকার ইউএনএইচসিআরের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে। এই কার্ড প্রদান একই সঙ্গে শরণার্থীদের জোর করে বার্মায় ফেরত পাঠানোর বিরুদ্ধে সরকারের অঙ্গীকারেরও পরিচায়ক। এই নথিকরণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের আনুষ্ঠানিক শরণার্থী মর্যাদা এবং শিবিরগুলোয় সুস্পষ্ট অপরাধ নথিকরণ ব্যবস্থার অভাবের কারণে তারা বিচার ব্যবস্থার অভিগম্যতা বঞ্চিত হচ্ছে, পরিণামে অন্যায় ও অবিচারের ঘটনা আমলে আসছে না এবং পাচারকারীরা পার পেয়ে যাচ্ছে।

<u>চলাফেরার স্বাধীনতা</u>: রোহিঙ্গাদের চলাফেরার স্বাধীনতায় বিধিনিষেধ অব্যাহত ছিল। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশ এবং ইউএনএইচসিআরের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দুটি শিবিরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। ২০১৭ সালের আগস্টে শরণার্থী ঢলের পর উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার বাইরে রোহিঙ্গাদের চলাচল আটকাতে পুলিশ সড়কে টহল চৌকি বসিয়েছে।

শিবিরে সহিংস হামলা, তুলে নিয়ে যাওয়া, অথবা অপহরণের উদ্বেগের প্রতিক্রিয়ায় অনেক শিবির কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে রাতের বেলা কারফিউ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর টহল চালু করেছে।

<u>কর্মসংস্থান</u>: বাংলাদেশে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের স্থানীয়ভাবে কাজ করার কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমতি সরকার দেয়নি। তবে শরণার্থী শিবিরের সীমানার ভেতরে নগদ অর্থের বিনিময়ে নির্মাণ বা মেরামতি কাজ করার অনুমতি দিয়েছে। চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ থাকলেও কিছুসংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী অবৈধভাবে বাইরের অনানুষ্ঠানিক খাতে মজুর হিসেবে কাজ করে। অবৈধভাবে কাজ করা কিছু অনিবন্ধিত রোহিঙ্গাও আছে। এরা মূলত দিনমজুরের কাজ করে।

<u>মৌলিক সেবায় অভিগম্যতা</u>: শিবিরে এবং অস্থায়ী বসতিগুলোতে ব্যাপক হারে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে। এর ফলে শিবিরের ভেতরে ও বাইরে উভয়স্থানে পরিষেবার ওপর ব্যাপক চাপের সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি) রোহিঙ্গাদের সহায়তার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার কাজের সমন্বয় করে। আইএসসিজির মত অনুযায়ী, রোহিঙ্গারা যে সীমিত জায়গায় গাদাগাদি করে থাকতো সেগুলো মৌসুমী বৃষ্টি বা ঝড়ের মোকাবিলা করার উপযোগী নয়। সহায়তাকারী সংস্থাগুলো সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরুর উদ্যোগ নিলেও জায়গার স্বল্পতা একটা বড় ইস্যু হয়ে দেখা দেয়। আর এর ফলে রোহিঙ্গাদের মৌলিক পরিসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১০ সালে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির বা অস্থায়ী বসতিগুলোর শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ পাওয়া এখনো একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আইএসসিজি-র তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে শিক্ষা কার্যক্রমে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ওপর নজর দেওয়া হয়। সেপ্টেম্বর নাগাদ শরণার্থী ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ৩৯ হাজার ৪ শ ৪৪। আশ্রয় শিবিরে প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক উভয় বয়সী শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব রয়ে গেছে। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের জন্যও শিক্ষার সুযোগ অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ সরকার নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা কারো জন্যই আনুষ্ঠানিক ও নিয়মিত সরকারি স্বাস্থ্যসুবিধা পাওয়ার অনুমতি দেয়নি। সরকারি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ রোহিঙ্গা শিবির ও এর আশেপাশে যেসব

স্বাস্থ্য সুবিধা রয়েছে তার তথ্য রাখে। স্বাস্থ্যখাতের তথ্য অনুযায়ী, রোহিঙ্গাদের জন্য ২৭৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। আরও ৩৭টি পরিকল্পনায় বা নির্মাণাধীন ছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রাপ্য সার্বিক স্বাস্থ্য সুবিধায় নেহাত ন্যুনতম চাহিদা মেটে।

রাষ্ট্রহীন মানুষ

বাংলাদেশে যেসব রোহিঙ্গা আছে তারা আইনত এবং বাস্তবেও রাষ্ট্রহীন মানুষ। তারা রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেনি। বার্মা সরকারও তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না।

সেকশন ৩: রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকার

সংবিধান প্রতিটি নাগরিককে সর্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সরকার নির্বাচিত করার অধিকার দিয়েছে।

নির্বাচন ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ

<u>সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহ</u>: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বারের মতো সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। নির্বাচনটি ছিল ভীষণভাবে একপেশে । এই নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি। নির্বাচনে জাল ভোট দেওয়া এবং বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট এবং ভোটারদের ভয় দেখানোসহ নানা ধরনের অনিয়ম ঘটেছে। ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ ও তার জোটসঙ্গীরা পার্লামেন্টের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয়লাভ করে। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও তার জোটসঙ্গীরা পায় মাত্র সাতটি আসন। নির্বাচনী প্রচার চলার সময় প্রতিপক্ষকে হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন, নির্বিচার গ্রেপ্তার ও সহিংসতার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ ওঠে। এর ফলে বিরোধী দলের অনেক প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের জন্য মুক্তভাবে সভা-সমাবেশ করা এবং প্রচারের কাজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগের এক মাস বিরোধী দল বিএনপি এবং তাদের জোটসঙ্গীদের ওপর এক হাজার ৩২৪টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটসঙ্গীদের ওপর সহিংসতা হয়েছে ২১১টি।

সরকার নির্বাচনের আগে এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনসের (এনফ্রেল) বেশিরভাগ নির্বাচন পর্যবেক্ষককে একটি আন্তর্জাতিক মানের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন পরিচালনার জন্য যে সময় দরকার তার মধ্যে পরিচয়পত্র ও ভিসা দেয়নি। এনফ্রেল ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে জানায়, ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার ৩২ টি আবেদনের মধ্যে ১৩টির অনুমোদন দিয়েছে। এতে জানানো হয়, নির্বাচন কমিশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুমোদন দিতে উল্লেখযোগ্যরকম দেরি হওয়ায় তারা ২২ ডিসেম্বর তাদের পর্যবেক্ষণ মিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে। স্থানীয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপের (ইডব্লিউজি) ২২ টি এনজিওর মধ্যে মাত্র সাতটিকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের অনুমতি দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ও নির্বাচন কমিশন।

এ বছরেই খুলনা, গাজীপুর, বরিশাল, রাজশাহী ও সিলেট সিটি করপোরেশনের নির্বাচন হয়। এসব নির্বাচনেও বিরোধী দলের প্রাথীদের হয়রানি, গ্রেপ্তার, ভীতি প্রদর্শন ও হামলার বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগ পাওয়া যায়। আবার নির্বাচনের দিনও ভোট জালিয়াতি, কারচুপি এবং বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পাঁচ সিটির নির্বাচনে চারটিতেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জেতেন। শুধু সিলেটে সামান্য ব্যবধানে বিএনপির প্রার্থীর কাছে হেরে যান আওয়ামী লীগের প্রার্থী।

রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: বিরোধীদলের নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা করতে সরকার আইনশৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে কাজে লাগায়। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে আদালত ২০০৮ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় হওয়া একটি দুর্নীতির মামলায় ৮ ফেব্র“য়ারি দণ্ডিত করে কারাগারে পাঠায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারের দায়ের করা আরও দুডজনের বেশি মামলার কারণে খালেদা জিয়া এ মামলায় পাওয়া জামিন কাজে লাগাতে পারেননি।

সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে পুলিশ বিএনপির প্রায় চার লাখ ৩৫ হাজার কর্মীকে ফৌজদারি মামলায় জড়ায়। এদের মধ্যে অনেককেই কারাগারে ভরা হয়। মানবাধিকার পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন, এর মধ্যে অনেক মামলাই ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের বিরুদ্ধে সরকারের বিগত বছরগুলোতে দায়ের করা ৮৬টি ফৌজদারি মামলার কোনোটিরই এ বছর সুরাহা হয়নি।তিনি জামিনপ্রাপ্ত হয়ে মুক্ত আছেন। মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল পুলিশের ওপর হামলা, বাস পোড়ানো এবং বোমা নিক্ষেপ। বিরোধী দলের আরও নেতাকর্মীর বিরুদ্ধেও এমন মামলা হয়। জামায়াতে ইসলামির নেতা-কর্মীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হয়রানির কারণে মত প্রকাশ এবং সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাননি। সরকার রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে এবং এর ফলে তারা নির্বাচনে দলের নাম ব্যবহার করে প্রার্থী দিতে পারেনি। এরপরও এ দলের নেতাকর্মীদের মত প্রকাশ এবং সমাবেশ করার মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হওয়া অব্যাহত থাকে। সরকার ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সমালোচনাকারী হিসেবে বিবেচিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের রোষানলে পরে। তাদের বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া হয়। এসব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান সরকারের রোষ থেকে রেহাই পেতে কিছু স্বআরোপিত নিষেধাজ্ঞাও অনুশীলন করে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত (যেমন, ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ) সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সহিংসতা চালানো ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ ওঠে যার জন্য তাদের বিচারের সম্মুখীন হতে হয়নি। বিরোধী দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছিল ওই সহিংসতার অন্যতম শিকার।

কিছু ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলোর সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠান ও সম্প্রচার মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের প্রচারে বাধার সৃষ্টি করেছে সরকার। জামায়াত তাদের দলীয় নিবন্ধন বাতিল করে ২০১২ সালে দেওয়া হাইকোর্টের রায় বাতিলের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করেছিল। তা আপিল বিভাগের বিবেচনাধীন থাকার মধ্যেই ২৮ অক্টোবর নির্বাচন কমিশন জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করে যাতে দলটি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্যতা হারায়।

নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণ: নারী ও সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কোনো আইনগত বাধা নেই। এ প্রক্রিয়ায় তারা অংশগ্রহণ করেছেন। জুলাই মাসে সংবিধান সংশোধন করে সংসদে নারীদের জন্য ৫০টি আসন আরও ২৫ বছর সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এই ৫০ নারী সাংসদ নির্বাচিত হন সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সাংসদের ভোটে। সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত আসনের আনুপাতিক হারে তাদের মধ্যে নারী আসন বণ্টন করা হয়।

সেকশন ৪. দুর্নীতি এবং সরকারে স্বচ্ছতার অভাব

বাংলাদেশের আইনে দুর্নীতির কারণে সরকারি কর্মকর্তাদের ফৌজদারি সাজার বিধান আছে। তবে সরকার কার্যকরভাবে সেই আইন বাস্তবায়ন করেনি। সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়ই নানা ধরনের দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়েছেন যেজন্য তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হয়নি।

দুর্নীতি: দুর্নীতি বাংলাদেশের একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর (টিআইবি) ২০১৮ সালের এক জরিপ অনুযায়ী, জনগণকে বিভিন্ন সেবাদানকারী ১৮টি সরকারি দপ্তর ও খাতের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। ৩০ আগস্ট প্রকাশিত টিআইবির এ প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্নীতিতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছে। এরপরে দুর্নীতিগ্রস্ত অন্যদের মধ্যে আছে বিচারবিভাগ, ভূমি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিমা প্রতিষ্ঠান এবং কর ও শুল্ক সংক্রান্ত দপ্তর। টিআইবির প্রতিবেদন অনুযায়ী, জরিপের আওতায় থাকা ৬৬ দশমিক ৫ শতাংশ খানাই দুর্নীতির শিকার হয়েছে।

গত ২০ আগস্ট, সরকারের পূর্বানুমতি না নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) কর্তৃক দুর্নীতির অভিযোগে সরকারি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার নিষিদ্ধ করে একটি আইন অনুমোদন করে মন্ত্রিপরিষদ। সুশাসন ও স্বচ্ছতা নিয়ে আন্দোলনকারীরা সরকারের এই পদক্ষেপের নিন্দা করে বলেন, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুরক্ষা দেওয়া আর সেই সঙ্গে দুদকের ক্ষমতা খর্ব করাই এর লক্ষ্য। তবে আইনটি কার্যকর হতে এখনও সংসদের অনুমোদন ও রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক সম্মতির প্রয়োজন।

দুদকের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দুই হাজার ৪৭৬টি মামলার মধ্যে ১৮০টি মামলার সুরাহা হয়েছে। এর মধ্যে ১১০টি মামলায় অভিযুক্তদের সাজা হয়েছে আর ৭০টিতে খালাস পেয়েছেন। অক্টোবর পর্যন্ত দুদকের কাছে দুই হাজার ৮০০ মামলা ছিল।

দুদক ২০১৭ সালে নাগরিকদের কাছ থেকে দুর্নীতির তথ্য জানতে একটি হটলাইন চালু করে। চালু করার প্রথম সাত দিনেই দুদক ৭৫ হাজার অভিযোগ পায়। ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত হটলাইনে আসা অভিযোগের সংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ মত। বেশিরভাগ অভিযোগেই সরকারের ভূমি অফিস, হাসপাতাল, রেল ও সড়ক দপ্তর, স্কুল এবং পরিষেবার নানা খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির কথা বলা হয়।

দুদক ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ৭৫৯ জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে শতাধিক মামলা দায়ের করে। সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারাও অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৮৩ জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধেঅভিযোগপত্র দায়ের করে দুদক। কমিশন ২০১৭ সালে ২৮৮ জন এবং ২০১৬ সালে ৩৯৯ জন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে অভিযোগপত্র দায়ের করে বলে *দৈনিক ইত্তেফাকের* এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়।

এ বছরের কৌশলগত পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দুদক বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দুর্নীতি পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের জন্য ২৫টি টিম গঠন করে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যেন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেজন্য দুদক একটি গোয়েন্দা ইউনিটও গঠন করেছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার দুদককে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর মধ্যে একটি অভিযোগ হচ্ছে, সরকারের সমালোচনার জন্য ব্যবসায়ী, সংবাদপত্রের মালিক, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মী এবং সুশীল সমাজের অনেকের বিরুদ্ধ দুদককে দিয়ে তদন্ত করানো বা তদন্ত শুরুর হুমকি দেওয়া হয়। দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে 'বেছে বেছে' রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ধরার নীতি নেওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট ২০১৭ সালে দুদককে তিরস্কার করেন।

সরকার পুলিশের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কমিউনিটি পুলিশিং কর্মসূচির সম্প্রসারণ অব্যাহত রেখেছে এবং নানা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

আর্থিক বিবৃতি: নির্বাচন কমিশনে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের সম্পদের বিবরণ জমা দেওয়ার আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। তবে আইনে সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ দেওয়ার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

সেকশন ৫: মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও বেসরকারি তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাব

সরকারি কিছু বিধিনিষেধের মধ্যেই কয়েকটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এখানে কাজ করে। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনার বিষয়ে অনুসন্ধান করে এবং তার ফল প্রকাশ করে। সরকারি কর্মকর্তারা এক্ষেত্রে তাদের খুব কমই সহায়তা করেন বা তাদের প্রকাশিত মতামতের বিষয়ে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো প্রায়ই সরকারের কড়া সমালোচনা করলেও তারা এক ধরনের স্বআরোপিত বিধিনিষেধও মেনে চলেছে। পর্যবেক্ষকেরা মন্তব্য করেছেন, জঙ্গিগোষ্ঠীর হুমকি এবং ক্রমেই বেশি করে অনড় অবস্থানে যাওয়া প্রধান রাজনৈতিক দলের কারণে দেশের সুশীল সমাজ এখন অনেক কমজোর। এমনকি সরকারি দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরাও প্রকাশ্যে সরকারি নীতির সমালোচনার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে গ্রেপ্তারের হুমকি পাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

সরকার মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের তহবিল এবং কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা এখনো বজায় রেখেছে। দুদক অধিকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা ২০১৬ সালে প্রত্যাহার করলেও অধিকারের কর্মীরা সরকারি কর্মকর্তা এবং আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর হয়রানি অব্যাহত রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে বাধাবিঘ্ন সৃষ্টির অভিযোগ। গত ৬ জুন স্পেশাল ব্রাঞ্চের (এসবি) কর্মকর্তারা অধিকারের অফিসে ঢুকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকাণ্ডের বিষয়ে নানা তথ্য চান। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মীর মোবাইল নম্বরও চান তারা। এরপর ২৫ জুন এসবির সদস্যরা আবার অধিকারের অফিসে গিয়ে সংগঠনটির সভাপতির বিষয়ে তথ্য চান। পরিবারের সদস্য এবং অধিকারের কর্মীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নানা ধরনের হয়রানির অভিযোগ করেন। তাদের দাবি, তাঁদের মোবাইল ফোন কল, ইমেইল এবং গতিবিধির ওপর নিরন্তর নজরদারি করা হয়।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ধর্মীয় সংগঠনসহ সব ধরনের এনজিওকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত হতে হয়। ধর্মীয় বিষয়, মানবাধিকার, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সমকামী,তৃতীয় লিঙ্গ ইত্যাদি জনগোষ্ঠী, রোহিঙ্গা শরণার্থী, শ্রমিক অধিকারসহ সংবেদনশীল নানা বিষয় বা জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ধরনের বাধার মুখে পড়তে হয়েছে। কিছু সংগঠনের দাবি, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের ওপর নজরদারি করেছে। সরকার মাঝেমধ্যে প্রকল্পের নিবন্ধন কাজ বিলম্বিত করে, কার্যক্রম বন্ধের চিঠি দিয়ে বা ভিসা প্রত্যাখান করে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে। সুশীল সমাজের কোনো কোনো প্রতিনিধি বলেছেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তাদের ব্যাপারে বারবার নিরীক্ষা করেছে। অথচ বেশিরভাগ সাধারণ নাগরিক নিরীক্ষার বাইরেই থেকে যায় বলা চলে।

২০১৭ সালের আগস্টের রোহিঙ্গা ঢলের পরিপ্রেক্ষিতে বহু এনজিও বাংলাদেশে এসে কাজ শুরু করে। এ বছর এনজিও ব্যুরো রোহিঙ্গাদের ত্রাণ কার্যক্রমে নিয়োজিত ৪১টি এনজিওর কাজের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। এনজিগুলোকে তাদের চলমান প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দেওয়া হয়বটে, তবে নতুন করে আর কোনো প্রকল্পের কাজ শুরু করতে দেওয়া হয়নি। সরকার এসব এনজিওর নাম প্রকাশ করেনি। কেন তাদের কর্মকাণ্ডের ওপর বিধিনিষেধ জারি হলো তা-ও জানায়নি।

"বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম) রেগুলেশন আইনে"র মাধ্যমে সরকার এনজিওগুলোর বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ করে। এই আইনে

দেশের সংবিধান, দেশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (অর্থাৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান ও নেতা) বিষয়ে 'অবমাননাকর' মন্তব্য করলে এনজিওগুলোর জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

জাতিসংঘ বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান: সরকার জাতিসংঘের গুম সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের বাংলাদেশ সফরে আসার অনুরোধের বিষয়ে কোনো জবাব দেয়নি।

সরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহ: বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার সংস্থার (এনএইচআরসি) পর্ষদ সাত সদস্যের। এর মধ্যে পাঁচজনই সাম্মানিক সদস্য। পর্যবেক্ষকেরা মনে করেন এনএইচআরসির সরকারি কর্মকর্তার সংখ্যা অপর্যাপ্ত এবং তাদের জন্য বরাদ্দও কম। এ বিষয়গুলো কমিশনের স্বাধীন ও কার্যকরভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা। এনএইচআরসির মূল কাজ হলো, মানবাধিকার সম্পর্কে

মানুষকে জানানো এবং প্রধান মানবাধিকার ইস্যুগুলোতে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

সেকশন ৬: বৈষম্য, সামাজিক নিগ্রহ ও মানবপাচার

নারী

ধর্ষণ ও পারিবারিক সহিংসতা: বাংলাদেশের আইনে কোনো পুরুষের দ্বারা নারী ধর্ষণ ও স্বামী/স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করা অপরাধ। তবে ১৩ বছরের বেশি বয়সী নারীর ক্ষেত্রে বৈবাহিক ধর্ষণ এই আইনে বিচার্য নয়। বাংলাদেশে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

বিভিন্ন যৌন সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে যার প্রতিকার হয়নি। পুলিশ ২০১৮ সালের ১৭ আগস্ট বগুড়ার শেরপুর উপজেলার আওয়ামী লীগ নেতা মোহাম্মদ আল হেলালকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তারের

চার ঘণ্টা পরই ছেড়ে দেয়। হেলালের বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে এক ১৮ বয়সী মেয়েকে তার বাড়িতে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ছিল। মেয়েটির চীৎকারে স্থানীয় মানুষ এগিয়ে এসে হেলালকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী মেয়েটির পরিবার থানায় মামলা করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খান মোহাম্মদ ইরফান মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানান। অভিযুক্ত হেলাল মামলা না করার জন্য ভুক্তভোগী মেয়েটির মাকে ১৮ হাজার টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেন। পরে অবশ্য ভুক্তভোগীর পরিবার বগুড়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল ২ -এ মামলা করেন (২০১৭)। জুলাই মাসে বগুড়ার ওই আদালত হেলালের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। পুলিশ হেলালকে গ্রেপ্তার করে হেফাজতে নিলেও পরে 'কারিগরী কারণ' দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর দেওয়া তথ্য অনুসারে, আইনি সহায়তার অভাব, সামাজিক কলঙ্ক, নতুন করে হয়রানির আশঙ্কা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণের আইনি বাধ্যবাধকতা ইত্যাদির কারণে ধর্ষণের শিকারদের অনেকেই ঘটনাটি প্রকাশ করেনি।

হাইকোর্ট এপ্রিল মাসে ধর্ষণের মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও সংশ্লিষ্ট অন্যদের জন্য ১৬ দফা একটি নির্দেশনা দেন। ধর্ষণের ঘটনা নথিবদ্ধ করায় দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে ২০১৫ সালের এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এই নির্দেশনা দেন।

এই নির্দেশনা অনুযায়ী, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) যেকোনো স্থানে ঘটা ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়ণের ঘটনার বিষয় নথিভুক্ত করতে বাধ্য। ঘটনা সংঘটনের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক/ডিএনএ টেস্ট করতে হবে। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি থানায় অবশ্যই একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা

রাখতে হবে। দায়িত্বরত কর্মকর্তা (ডিউটি অফিসার) ধর্ষণ বা যৌন নিপীড়ণের ঘটনা রেকর্ড করার সময় ওই নারী কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। ভুক্তভোগীর মুখ থেকে ঘটনা রেকর্ড করার সময় একজন আইনজীবী, একজন সমাজকর্মী, কোনো সুরক্ষা কর্মী বা ভুক্তভোগী যথাযথ মনে করেন এমন কেউ থাকবেন। ভুক্তভোগী প্রতিবন্ধী হলে প্রয়োজনে সরকার তার বিবৃতি রেকর্ড করতে সহায়তার ব্যবস্থা করবে। তদন্তকারী কর্মকর্তা একজন নারী পুলিশ কর্মকর্তা কে সঙ্গে নিয়ে সময়মতো ভুক্তভোগীর মেডিকেল পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

অন্যান্য ক্ষতিকর প্রথা: কিছু এনজিও যৌতুকের কারণে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনার কথা জানিয়েছে। এইচআরএসএসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত যৌতুকের কারণে ৩৫ জন নারী হত্যার শিকার হয়েছেন। একই কারণে আরও ৪১ নারী মারধরে আহত হন।

৬ মার্চ রিমা বেগম নামের এক নারী উজিরপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মারা যান। তিনি যৌতুকের কারণে স্বামীর হাতে নির্যাতিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত রিমার ভাই আরিফ বলেন, কম যৌতুক দেওয়ার কারণে দেড় বছরের বৈবাহিক জীবনে তাঁর বোন প্রায়ই স্বামী শিপন হাওলাদার ও শশুর -শাশুড়ির হাতে নির্যাতনের শিকার হতেন। রিমা বেগমের বাবা আক্কেল আলী তাঁর মেয়েকে হত্যার অভিযোগে মেয়ের জামাই শিপন হাওলাদার ও তার বাবা-মাকে আসামি করে উজিরপুর থানায় মামলা করেন।

১৬ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদ ১৯৮০ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনের অপব্যবহার ঠেকাতে আইনটি সংশোধন করে এবং আরও কিছু বিষয় যুক্ত করে 'যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮' অনুমোদন করে। এতে যৌতুক নিরোধ আইনের আওতায় মিথ্যা মামলা করার জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এই আইনে যৌতুক দাবিকারী ব্যক্তির এক থেকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ শুধু ধর্মীয় কোনো বিষয় নিষ্পত্তিতে ফতোয়াকে (ধর্মীয় বিধান) বৈধ করে আদেশ দিয়েছেন। তবে কাউকে কোনো শাস্তি দেওয়াকে বৈধ করতে এটি কাজে লাগানো যাবে না বা এটি প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনের ওপর প্রাধান্য পাবে না। ইসলামি প্রথা অনুযায়ী, শুধু ইসলামি আইনে অভিজ্ঞ ধর্মবেত্তারাই ফতোয়া জারি করতে পারেন। তবে এমন বিধান থাকা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলের ধর্মীয় নেতারা কিছু ক্ষেত্রে ফতোয়া জারি করেছেন। এসব ফতোয়ার মাধ্যমে অনুমিত নৈতিক বিচ্যুতির জন্য বিচারবহির্ভূতশাস্তি দেওয়া হয়েছে। অনেক সময়ই এর শিকার হয়েছেন নারীরা।

নারীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হামলা/নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, অনেক ক্ষেত্রে যার নেতৃত্ব দিয়েছেন ফতোয়া কার্যকরকারী ধর্মীয় নেতারা। হামলা/নির্যাতনের ঘটনার মধ্যে ছিল দোররা মারা, পেটানো বা অন্য ধরনের শারীরিক নির্যাতন।

দুষ্কৃতিকারীরা কিছু ব্যক্তির মুখে অ্যাসিড ছুড়ে মেরেছে, সাধারণত নারীরাই এর শিকার। অ্যাসিডের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের শরীরের সংশ্লিষ্ট অংশ ঝলসে বিকৃত হয়ে যায়। আবার কখনোবা তারা অন্ধ হয়ে যান। সাধারণত প্রেম/বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বা ভূমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুষ্কৃতকারীরা অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। এইচআরএসএস-এর তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নারীদের ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের ১৩টি ঘটনা ঘটেছে। অ্যাসিডের সহজলভ্যতা কমাতে ও নারীর ওপর অ্যাসিড নিক্ষেপের প্রবণতা হ্রাস করতে আইন আছে। তবে আইনটি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং কম প্রয়োগ হওয়ায় এর কার্যকারিতা সীমিত। শুধু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবন্ধিত ক্রেতাদের কাছে অ্যাসিড বিক্রির বিধান করেছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায় ৪ ফেব্রুয়ারি সুজন চন্দ্র পাল ও অর্জুন চন্দ্র পাল নামে দুই ব্যক্তি আরও দুই দুষ্কৃতকারীর সহায়তায় নববিবাহিতা ঝর্ণা রানীর ওপর অ্যাসিড ছোড়ে। এ সময় ঝর্না তার স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে যাচ্ছিলেন। পাল পরিবার ঝর্নার স্বামী দিলীপ কুমারের সঙ্গে তাদের পরিবারের এক মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। দীলিপ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ঝর্না রানীর বাবা বালিয়াডাঙ্গি থানায় সন্দেহভাজন অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বছরের শেষ পর্যন্ত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়নি।

যৌন নিপীড়ন: ২০০৯ সালেই হাইকোর্ট যৌন হয়রানি নিষিদ্ধ করে একটি নির্দেশনা দেয়। তবে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির (বিএনডব্লিউএলএ) ২০১৬ সালের এক নথিতে বলা হয়, যৌন নিপীড়নের সমস্যা রয়েই গেছে। আর হাইকোর্টের নির্দেশনার ব্যাপারে নজরদারি ও বাস্তবায়ন কমই হয়। এ সমস্যার কারণে অনেক মেয়ে বা নারী স্কুলে বা কর্মস্থলে যেতে পারেন না।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বলপ্রয়োগ: জোরপূর্বক গর্ভপাত বা বন্ধ্যাকরণের কোনো অভিযোগ নেই।

বৈষম্য: বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান এবং আইনের সমান সুরক্ষা লাভের অধিকারী। 'রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে' নারীদের পুরুষের সমান অধিকারেরও স্বীকৃতি দিয়েছে সংবিধান। মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা এনজিওগুলোর ভাষ্য, সরকার সবসময় সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারা বা লৈঙ্গিক সমতা বিষয়ক আইনগুলো কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। নারীরা পরিবার, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করে না। মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী, পরিবারের মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক সম্পত্তি পায়। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী,মৃত স্বামীর সম্পত্তির ওপর হিন্দু বিধবা নারীর অধিকার সীমিত- শুধু তার জীবিতকাল পর্যন্ত। বিধবা নারীর মৃত্যুর পর সম্পত্তি আবার স্বামীর পুরুষ বংশধরদের কাছে চলে যায়।

শিশু

জন্ম নিবন্ধন: মা ও বাবা বাংলাদেশি নাগরিক হলে তাদের সন্তান বাংলাদেশি হবেন। বাবা-মা'র পরিচয় অজ্ঞাত হলেও বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণকারী ব্যক্তি নাগরিক হবেন। এছাড়া যার পিতা বা পিতামহ বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিনিও এদেশের নাগরিক হবেন। কেউ উত্তরাধিকার সূত্রে নাগরিক হলে তাঁর পিতা বা পিতামহকে ১৯৭১ সালে বা তার পরে বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বাংলাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট পেতে জন্ম নিবন্ধন থাকতে হয়।

শিক্ষা: বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। মেয়ে শিক্ষার্থীদের দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলে পাঠানোর জন্য সরকার বাবা-মাকে আর্থিক সহায়তা দেয়। স্কুলে পাঠগ্রহণ বিনা বেতনে হলেও শিক্ষকের বেতন, বইপত্র ও স্কুলের পোশাকের জন্য যে অর্থ ব্যয় করতে হয় তা এখনো অনেক পরিবারের জন্য বেশি। শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে সরকার প্রতি বছর বেশ কয়েক কোটি পাঠ্যবই বিনামূল্যে বিতরণ করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলে–মেয়ের সংখ্যায় সমতা আছে। তবে প্রাথমিক শেষ করার পর মাধ্যমিকে মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের হার বেশি। বাল্য বিয়ে বা জোর করে বিয়ে দেওয়াটা মাধ্যমিকে মেয়েদের কম হারের একটি কারণ।

শিশু নির্যাতন: শিশুদের ওপর যৌন নিপীড়ন, শারীরিক ও অপমানজনক শাস্তি, সন্তান ফেলে যাওয়া, অপহরণ, পাচার ইত্যাদি নানা ধরনের অনিয়ম-নির্যাতন এখনো বড় এবং ব্যাপক পরিসরে ঘটা সমস্যা। বাড়ি, সমাজ, স্কুল, আবাসিক প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে- ইত্যাকার সব জায়গায় শিশুরা নিপীড়ণের ঝুঁকির

মধ্যে থাকে। ২০১৬ সালে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সরকার বিনামূল্যের 'শিশু হেল্পলাইন -- ১০৯৮' চালু করে। সহিংসতা, নির্যাতন ও শোষণের শিকার হওয়া শিশুদের সহায়তার জন্য এটি চালু করা হয়।

৪ আগস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন দেশের ৬৯টি শিশু আদালতে সাড়ে ২১ হাজারের বেশি মামলা ঝুলে থাকার কথা উল্লেখ করে আদালতগুলোর ৭৫ জন বিচারকের ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেন। এর মধ্যে ৬১৪টি মামলা ঝুলে আছে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে। শিশু আইন ২০১৩-এ দেশে শিশুবান্ধব আদালত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি নজরদারি সংস্থা প্রতিষ্ঠাসহ কিছু অগ্রগতি হলেও শিশু পাচারের ঘটনা ও এবং পাচারের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া শিশুদের যথাযথ যত্ন ও সুরক্ষার বিষয়টি এখনো একটি সমস্যা।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে- প্রধানত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে- শিশু শ্রম এবং কর্মক্ষেত্রে শিশুদের ওপর নির্যাতন এখনো রয়ে গেছে। শিশু গৃহকর্মীরা তাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে সব ধরনের নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

<u>বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিয়ে</u>: আইন অনুসারে নারীর বিয়ের বৈধ বয়স ১৮ বছর ও পুরুষের ২১ বছর। ২০১৭ সালে জাতীয় সংসদে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাস হয়, যেখানে 'বিশেষ ক্ষেত্রে' যেকোনো বয়সে নারী ও পুরুষের বিয়ের বিধান রাখা হয়েছে। সরকার এই আইনের ক্ষেত্রে শিশু অধিকার সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন ও উন্নয়ন সহযোগীদের উদ্বেগ ও সুপারিশগুলো উপেক্ষা করেছে। ২০১৭ সালে বিএনডব্লিউএলএ-এর এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ের যে বিধান রাখা হয়েছে, তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না তা সরকারের কাছে জানতে চেয়ে রুল জারি করেন। বিএনডব্লিউএলএর আবেদনে বলা হয়, মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়েকে একটি 'চুক্তি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ কোনো চুক্তির একটি পক্ষ হতে পারে না।

জুন মাসে অভয়নগর উপজেলা প্রশাসন বন্যা রায় নামে ১৫ বছর বয়সী এক কিশোরীর বাল্যবিবাহ বন্ধ করে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রশাসনের কর্মকর্তা ও পুলিশ বিয়ের মূল আয়োজনের অল্প কিছু সময় আগে হাজির হন। বর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়েছিল। তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান। কিশোরী বন্যা রায়কে পরে তার মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

সরকারি তথ্য অনুসারে, দেশে ২০১১ সালে ৫২ শতাংশ নারী বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিল। ইউনিসেফের ২০১৮ সালের প্রতিবেদন অনুসারে এই হার ছিল ৫৯ শতাংশ। নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব অবশ্য ইউনিসেফের অনুসন্ধানের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে প্রথম আলো পত্রিকার কাছে দাবি করেন, এ বছর দেশে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বৈশ্বিকভাবে বাল্যবিবাহের হার কমেছে ১৫ শতাংশ। দক্ষিণ এশিয়ায় এই কমার হার ৩০ শতাংশ।

বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ কমানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক পর্যায়ের পরও লেখাপড়া চালিয়ে যেতে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। ১৮ বছর হওয়ার পর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে বোঝাতে সরকার ও বেসরকারি সংগঠনগুলো (এনজিও) অভিভাবকদের জন্য কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করেছে ।

<u>শিশুদের যৌন নিপীড়ন</u>: শিশুকে যৌন নিপীড়নের শাস্তি সর্বনিম্ন ১০ বছরের কারাদন্ড, সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদন্ড । শিশু পর্নোগ্রাফি এবং এ ধরনের উপকরণ বিক্রি বা বিতরণ নিষিদ্ধ।

<u>বাস্তুচ্যুত শিশু</u>: সেকশন ২.ঘ দ্রষ্টব্য

ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড অ্যাবডাকশনস: দেশটি ১৯৮০ সালের 'হেগ কনভেনশন অন দ্য সিভিল অ্যাসপেক্টস অব ইন্টারন্যাশনাল চাইল্ড অ্যাবডাকশন'-এর স্বাক্ষরকারী পক্ষ নয়। 'ইন্টারন্যাশনাল প্যারেন্টাল চাইল্ড অ্যাবডাকশন'-এর ওপর পররাষ্ট্র দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন দেখুন: https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data.html

ইহুদি বিদ্বেষ

দেশটিতে কোনো ইহুদি সম্প্রদায় নেই। তবে রাজনীতিক ও ধর্মীয় নেতারা প্রায়শই নিজেদের এলাকায় সমর্থন আদায়ে ইহুদি বিদ্বেষী বক্তব্য দিয়ে থাকেন।

মানবপাচার

পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবপাচার বিষয়ক প্রতিবেদন দেখুন: www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

প্রতিবন্ধী

আইনে প্রতিবন্ধীদের জন্য সমানাধিকার ও বৈষম্য থেকে রক্ষার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু সরকার কার্যকরভাবে এসব বিধান প্রয়োগ করেনি।

যেমন, আইনে ভৌত অবকাঠামোগুলোতে প্রতিবন্ধীদের প্রবেশের সুব্যবস্থা রাখার কথা থাকলেও সরকার কার্যকরভাবে এ বিধান বাস্তবায়ন করেনি। আইনটি বাস্তবায়নে স্থানীয় কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ কমিটিই এখনো সক্রিয় হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই আইনের অধীনে তাদের দায়িত্ব কী তা জানে না। ২০১৬ সালে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠনের (এনজিও) প্রস্তুত করা এক প্রতিবেদনে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবহেলার চিত্র উঠে আসে। এ ক্ষেত্রগুলো হলো: ভৌত অবকাঠামোতে অভিগম্যতা, ন্যায়বিচারের সুযোগ, নারী প্রতিবন্ধীদের অধিকার, শোষণ, সহিংসতা ও নিপীড়ন থেকে সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মক্ষেত্র পাওয়ার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার এবং রাজনৈতিক অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চাকরিতে প্রবেশের সুযোগের হিসেব রাখার জন্য আইনটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিবন্ধনের মাধ্যমে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এই নিবন্ধনের মাধ্যমে তারা ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি, ভোটদান ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন । এতে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তি, সংগঠন, কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈষম্য করবে না। প্রতিবন্ধকতার কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মস্থল কিংবা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য করলে দোষী ব্যক্তি অর্থদন্ড অথবা তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হবেন। তবে এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ দেখা যায়নি।

আইনটির লক্ষ্য পূরণ করতে এই আইনে ২৭ সদস্যের একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে যেটি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করবে। আইনটির বাস্তবায়ন ধীর হওয়ায় এই আইনে বর্ণিত প্রতিবন্ধী অধিকার ও সুরক্ষা কমিটি গঠন ও কার্যকর হওয়া বিলম্বিত হয়েছে।

এনজিও অ্যাকশন এগেইনস্ট ডিজ্যাবিলিটির তথ্যানুসারে, ৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিশু সরকারি শিক্ষার সুযোগ পায়নি। সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছে। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করেছে সরকার।

এই আইনে অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে অনেক সময়ই এই অধিকার অনুশীলন করা নির্ভর করে পারিবারিক ও এলাকার পরিস্থিতির ওপর।

আইনটিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সরকার প্রদত্ত আইনি সেবার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য ডিজ্যাবলড-এর।

প্রতিবন্ধীদের ওপর সহিংসতা ও নিপীড়নের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করতে দাপ্তরিক পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি পুলিশ আমজাদ আলী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। আমজাদ কোন কৃষিজ পণ্য দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ওই কিশোরীকে খোলা মাঠে নিয়ে যায়। মেয়েটির চিৎকারে তার বোন ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে আমজাদ পালিয়ে যায়। এরপর এলাকাবাসী জাতীয় হেল্প ডেস্কে টেলিফোন করেন। ভুক্তভোগী কিশোরীর পরিবার আমজাদের বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে।

এক মাস বয়সী শিশু আকিতা খাতুনকে খুনের ঘটনায় গত ২১ জানুয়ারি পুলিশ তার বাবা, দাদা-দাদি ও ফুপুকে গ্রেপ্তার করে। আকিতা অপরিণত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে এবং তার গুরুতর প্রতিবন্ধকতা ছিল। ঈশ্বরদীর সহকারী পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জহুরুল হকের দেওয়া তথ্যমতে, আকিতার পরিবার প্রতিবন্ধী শিশুটির বোঝা বহনে আগ্রহী ছিল না। স্বজনেরা নবজাতকটিকে তার মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে একটি আলমারিতে লুকিয়ে রাখে। পরে পুলিশ ওই আলমারি থেকে আকিতার মৃতদেহ উদ্ধার করে। তার মা নিশি খাতুন পুলিশকে বলেছেন, ছেলে সন্তান জন্ম দিতে না পারায় এবং শিশুটি প্রতিবন্ধী হওয়ায় শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে নির্যাতন করেছে। আকিতার বাবা, দাদা-দাদি ও ফুপুর বিরুদ্ধে দায়ের মামলাটি এখন বিচারের অপেক্ষায়।

মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য সরকারি ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। শিশুদের সম্ভাব্য স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রতিটি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিশু বিকাশ কেন্দ্র খুলেছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসাগত ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য কিছু বেসরকারি উদ্যোগও রয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন এনজিও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা দিয়েছে ও তাদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। সরকার দেশের ৬৪ জেলাতে ১০৩টি প্রতিবন্ধী তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পুনর্বাসন সেবা ও সহায়ক যন্ত্র সরবরাহ করে। সরকার অটিজম নিয়ে গবেষণা ও এ সমস্যার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতেও উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবন্ধী ভাতাসহ সমাজকল্যাণমূলক ভাতা প্রদান করতে সরকার একটি ইলেকট্রনিক বিতরণ ব্যবস্থা চালু করেছে।

সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ নাগরিক জীবনে অংশগ্রহণ সীমিত রয়ে গেছে।

জাতীয়/বর্ণগত/জাতিগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু

বাইরের সহিংস চরমপন্থায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বড় কোনো হামলার ঘটেনি। তবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সম্পত্তি ও উপাসনালয়ে হামলার খবর পাওয়া গেছে। এক ফেসবুক পোস্টে ইসলাম অবমাননার গুজব রটার জেরে ২০১৭ সালের নভেম্বরে রংপুরে ৩০টির মতো হিন্দু বাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় মুসলমান গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করেনি।

বিভিন্ন এনজিওর তথ্যমতে, জাতীয় পরিচয়, বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠীগতভাবে সংখ্যালঘু মানুষের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ঘটনা ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় দলিত (নিম্ন বর্ণের হিন্দু ধর্মাবলম্বী) সম্প্রদায়ের কিছু

মানুষের জন্য জমির মালিক হওয়া এবং যথাযথ আবাসন সুবিধা, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়ার সুযোগ ছিল খুবই সীমিত।

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

দেশজুড়ে সরকারি চাকরি ও উচ্চতর শিক্ষায় পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর জন্য সরকার কোটার ব্যবস্থা রাখলেও ওই অঞ্চলের আদিবাসীরা ব্যাপক বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তিতে স্থানীয় শাসনের বিধান রাখা হলেও এই পরিস্থিতি এখনো অব্যাহত। ওই শান্তিচুক্তি এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা তাদের জমির ওপর প্রভাব ফেলে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ভূমি কমিশন আইনের আওতায় ভূমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে মতানৈক্যই এর কারণ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার বাইরে দেশের অন্য এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীগুলো বাঙালি মুসলমানদের কাছে জমি খোয়ানো অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছে। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষে কাজ করা সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, বার্মা (মিয়ানমার) থেকে আসা রোহিঙ্গারা ক্রমেই জমি দখল করে যাচ্ছে। সরকার মৌলভীবাজার ও মধুপুরের বনাঞ্চলে প্রথাগতভাবে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মালিকানাধীন জমিতে বিভিন্ন নির্মাণ প্রকল্প অব্যাহত রেখেছে। ডেইলি স্টার সংবাদপত্রে ৯ আগস্ট প্রকাশিত এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অব্যাহত জমি দখলের চেষ্টার মুখে জানুয়ারি মাসে বান্দরবানের সাইঙ্গিয়া মারমাপাড়ার সর্বশেষ ছয়টি পরিবার গ্রামছাড়া হয়েছে। এই গ্রামে একসময় ৪২টি মারমা পরিবারের বাস ছিল। কিন্ত ওইসব পরিবারের বেশির ভাগই 'ভূমি দখলকারীদের' হুমকি-ধামকির কারণে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। ওই গ্রামের হেডম্যানের তথ্যমতে, তাদের ফেলে আসা জমি ও জুমের ফসল এখন 'সিলভান উই রিসোর্টস অ্যান্ড স্পা লিমিটেড' এর চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন মন্টুর নিয়ন্ত্রণে। ওই আদিবাসী নেতা এখন পাশের একটি গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি ব্যবহারের কর্তৃত্ব নিজের কাছেই রেখেছে। ভূমি কমিশন- যাদের কাজ হলো তদন্তসাপেক্ষে অবৈধভাবে দখল করা জমি প্রকৃত মালিকের কাছে ফেরত দেওয়া- এ বছর জমি সংক্রান্ত কোনো বিরোধেরই মীমাংসা করেনি।

পৃথক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর অধীনে সংগঠিত থাকা চাকমা ও মারমা আদিবাসী গোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে আন্তঃগোষ্ঠী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে যাতে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি ঘটেছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সংঘাতে উভয়পক্ষের অন্তত ৩৪ জন নিহত হয়েছে। ১৮ আগস্ট খাগড়াছড়ি জেলায় দুটি হামলায় ইউনাইটেড পিপলস' ডেমোক্রেটিক ফোরামের (ইউপিডিএফ) তিন নেতাসহ সাতজন নিহত ও ছয়জন আহত হয়। ওইসব হামলায় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। ২৮ মে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলায় একটি বাড়িতে বৈঠক করার সময় বন্দুকধারীর গুলিতে ইউপিডিএফের তিন সদস্য নিহত হন। ৩ মে রাঙামাটির নানিয়ারচর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (পিসিজেএসএস- এমএন লারমা) নেতা শক্তিমান চাকমা কাজে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। পিসিজেএসএস এ ঘটনার জন্য ইউপিডিএফকে দায়ী করে। তবে ইউপিডিএফ এই অভিযোগ অস্বীকার করে। নির্দিষ্ট এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করেই মূলত ইউপিডিএফ ও পিসিজেএসএসের মধ্যে এবং সংগঠন দুটির অভ্যন্তরে সংঘাতগুলোর ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, এই দুটি সংগঠনের অনেক নেতা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত। প্রাণহানি ও সহিংসতার ঘটনাগুলো এখনো অনিষ্পন্ন।

আদিবাসী নারী ও শিশুদের ওপর প্রতিবেশী বাঙালি অথবা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের অভিযোগও পাওয়া গেছে। কাপেং ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত অন্তত ৩২ জন উপজাতি নারী ও শিশু যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১১ জনকে ধর্ষণ এবং চারজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের তথ্যমতে, বান্দরবানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) দুই সদস্য ত্রিপুরা উপজাতির দুই কিশোরীকে অর্থের বিনিময়ে যৌনতার প্রস্তাব করেছিলেন। মেয়েদুটি ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বিজিবির ওই দুই সদস্য গত ২২ আগস্ট তাদের ধর্ষণ করেন। নাইখ্যংছড়িতে বিজিবির ব্যাটালিয়ন কমান্ডার দুই সদস্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ গুজব বলে অস্বীকার করলেও তা 'খতিয়ে দেখার' প্রতিশ্রুতি দেন।

১২ ও ১৭ বছর বয়সী ওই দুই কিশোরীকে যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানে ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং সংবাদমাধ্যম ও এনজিও কর্মীদের মেয়েদুটির সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি।

২২ জানুয়ারি রাঙামাটির ওরাছড়ি গ্রামে অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যের বিরুদ্ধে ১৮ বছর বয়সী এক মারমা তরুণীকে ধর্ষণ ও তাঁর ১৩ বছর বয়সী বোনকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে ওই অভিযোগ অস্বীকার করলেও ধর্ষণের অভিযোগের সম্মুখীন এক সদস্যকে ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে প্রশাসনিকভাবে যুক্ত করেন। নাগরিক সমাজের চাপে পুলিশ সাধারণ ডায়রি (জিডি) নিলেও সাংবাদিক ও এনজিওকর্মীদের ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি।

যৌন আচরণের ধরন এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সহিংসতা, বৈষম্য ও অন্যান্য নিপীড়ন

সমলিঙ্গ যৌনতা বাংলাদেশের দন্ডবিধি অনুযায়ী বেআইনি। সরকার সক্রিয়ভাবে আইনটি প্রয়োগ করে না। এলজিবিটিআই সংগঠনগুলোর মতে, সরকার সামাজিক চাপের কারণে আইনটি ধরে রেখেছে। এলজিবিটিআই সংগঠনগুলোর মতে, পুলিশ এলজিবিটিআই মানুষের পাশাপাশি যৌনাচরণ যেমনই হোক, মেয়েলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে বিবেচিত পুরুষদের হয়রানি করতে এবং এলজিবিটিআই সংগঠনগুলোর নিবন্ধন নিয়ন্ত্রিত রাখতে আইনটি কাজে লাগায়। পুলিশের দন্ডবিধির সন্দেহজনক আচরণের ধারা ব্যবহার করেও হয়রানি করা হয় বলে কিছু সংগঠন অভিযোগ করেছে। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা অনেক দিন ধরেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হলেও সমাজের অংশ বলে স্বীকৃত। তবে তারা এখনো ব্যাপক ভীতি ও হয়রানির শিকার হচ্ছে এবং অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর ওপর উগ্রপন্থীদের সহিংস হামলার পরিপ্রেক্ষিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে।

এলজিবিটিআই গোষ্ঠীর সদস্যদের টেলিফোন, খুদে বার্তা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তাদের কিছু সদস্য পুলিশের হাতেও হয়রানির শিকার হয়েছে।

আবাসন, কর্মসংস্থান, জাতীয়তা আইন এবং স্বাস্থ্যসেবার মতো সরকারি সেবার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এলজিবিটিআই ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈষম্য করা দেশের আইনে নিষিদ্ধ করা হয়নি। এলজিবিটিআই সংগঠনগুলো কর্মসংস্থান ও পেশাগত ক্ষেত্র, আবাসন ও সরকারি সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বৈষম্যের অভিযোগ করেছে।

এলজিবিটিআই ব্যক্তিদের সঙ্গে ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জবরদস্তিমূলক 'চিকিৎসা' বা মানসিক চিকিৎসার মতো আচরণ বা সাজার কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

সুনির্দিষ্টভাবে নারী সমকামীদের (লেসবিয়ান) সহযোগিতা দেওয়া সংগঠন এখনো নেই বললেই চলে। বিশেষ ধরনের যৌন আচরণের ব্যাপারে সামাজিক কলঙ্কের মনোভাব খুবই প্রবল এবং তা এ বিষয়ে খোলামেলা আলোচনার পথে একটা বাধা।

বছরের শেষে এসেও ২০১৬ সালে নিহত হওয়া মানবাধিকার কর্মী জুলহাজ মান্নানের খুনের ঘটনা অনিষ্পন্ন রয়ে গেছে।

এইচআইভি এবং এইডস বিষয়ক সামাজিক কলঙ্ক

এইচআইভি ও এইডস এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামাজিক কলঙ্ক স্বাস্থ্য পরিসেবাগুলোর সুযোগ পাওয়ার পথে বাধা হতে পারে, বিশেষ করে ট্রান্সজেন্ডার সম্প্রদায় এবং সমকামী পুরুষদের জন্য।

অন্যান্য সামাজিক সহিংসতা বা বৈষম্য

দলবেঁধে পিটিয়ে/হামলা করে হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলো স্বীকার করেছে যে প্রকাশিত ঘটনার সংখ্যা সম্ভবত প্রকৃত ঘটনার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। অবৈধ ফতোয়া এবং গ্রাম্য সালিসিও ঘটেছে। একটি বিশিষ্ট স্থানীয় এনজিওর মতে, ধর্মীয় আলেমের বদলে বরং স্থানীয় নেতারাই এসব বিচারের রায় দিয়েছেন। অধিকার এর হিসাবে জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ৪৫ জনকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে, প্রধানত গণপিটুনিতে তাদের হত্যা করা হয়েছে।

সেকশন ৭: শ্রমিকের অধিকার

ক। সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং কালেক্টিভ বার্গেনিংয়ের (ইউনিয়ন করা) অধিকার

বিদ্যমান আইন শ্রমিক ইউনিয়নে যোগদান এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেয়। তবে শ্রম অধিকার সংগঠনগুলির ভাষ্য হচ্ছে ইউনিয়ন নিবন্ধনের প্রক্রিয়া এখনো জটিল।

আইন অনুযায়ী একটি প্রতিষ্ঠানের ন্যুনতম ২০ শতাংশ কর্মী সদস্য হতে রাজি থাকলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কোনো ইউনিয়ন নিবন্ধনের অনুমোদন দিতে পারে। কোনো ইউনিয়নের সদস্য ২০ শতাংশের নিচে নামলে মন্ত্রণালয় তার নিবন্ধন বাতিলের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। আইন সাধারণত ‘ওয়াল টু ওয়াল’ (সম্পূর্ণ কারখানা) বার্গেনিং শাখার অনুমোদন দেয়।

শ্রম আইনের সংজ্ঞায় ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধানমূলক ও প্রশাসনিক কর্মীদের শ্রমিক ধরা হয় না। অগ্নিনির্বাপণ কর্মী, নিরাপত্তা রক্ষী, এবং নিয়োগকর্তাদের গোপনীয় সহায়তাকারীরা ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার রাখেন না। সিভিল সার্ভিস এবং নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মীদেরও ইউনিয়ন গঠন নিষিদ্ধ। শ্রম অধিদপ্তর শ্রম আদালতের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য কারণেও ইউনিয়নগুলিকে বাতিল করতে পারে। তবে আইনে ইউনিয়ন বাতিল বা নিবন্ধন প্রত্যাখানের ক্ষেত্রে আপিল করার অধিকার রয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) ট্রেড ইউনিয়নের অনুমতি দেয় না যা জাতীয় শ্রম আইনের একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

সম্ভাব্য ইউনিয়নগুলো এখনো তাদের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যানের কথা জানাচ্ছে যাতে এমন সব কারণ দেখানো হচ্ছে যা আইনের তালিকায় নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ২০১৭ সালে জানায়, দেশে তখন ৭,৭৫১ টি ট্রেড ইউনিয়ন ছিল। এর মধ্যে প্রায় ৩০ লাখ শ্রমিক ছিল। আর তৈরি পোশাক খাতে ইউনিয়ন ছিল ৫৯৬টি। এর মধ্যে ছিল তৈরি পোশাক খাতে ২০১৩ সাল থেকে গঠিত ৫৬১ টি নতুন ইউনিয়ন। মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছিল, চিংড়ি চাষ খাতে ১৬ টি এবং চামড়া ও ট্যানারি খাতে ১৩ টি ইউনিয়ন ছিল। সলিডারিটি সেন্টারের বক্তব্য অনুযায়ী, তৈরি পোশাক খাতের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিয়ন এ বছর নিষ্ক্রিয়থাকে। কারখানা বন্ধ থাকা বা মালিকপক্ষের কথিত আইনবহির্ভূত কার্যকলাপই ছিল এর কারণ। অপেক্ষাকৃত বড় পোশাক কারখানাগুলোতে ইউনিয়ন নিবন্ধন ক্রমেই বেশি করে কঠিন হয়ে উঠেছে। ২০১৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের আবেদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেকে প্রতি

বছরই এর হার কমেছে। এ বছর ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার আবেদন আবার কমে যায়, তবে শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক আবেদন অনুমোদনের হার বেড়েছে।

দেশের আইন আইনসঙ্গতভাবে ধর্মঘট পরিচালনা করার অধিকার দেয়। কিন্তু এর অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার কোনো ধর্মঘট 'জনমানুষের জন্য গুরুতর দুর্ভোগ' সৃষ্টি করতে পারে মনে করলে তা নিষিদ্ধ করতে পারে। কিংবা ৩০ দিনের বেশি স্থায়ী ধর্মঘটের অবসান ঘটাতে পারে। এছাড়া আইনে বাণিজ্যিক উৎপাদনের প্রথম তিন বছরের জন্য ধর্মঘট নিষিদ্ধ। কারখানায় যদি বিদেশি বিনিয়োগ থাকে বা কোনো বিদেশি বিনিয়োগকারী এর মালিক হয় তাহলেও ধর্মঘট করা যাবে না। শ্রমিক ও ইউনিয়ন কর্মীরা এখনো ২০১৬ সালে ঢাকার শিল্প উপশহর আশুলিয়ার ব্যাপক ধর্মঘটের নানারকম জের টেনে যাচ্ছে। ওই ধর্মঘটের সময় অন্তত ১৬০০ কর্মীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। এছাড়াও ২৫ জনের মতো শ্রমিক নেতা ও কর্মীকে জেলে যেতে হয়। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ কারখানাগুলো কার্যক্রম আবার শুরু করে। তবে শ্রমিক নেতা ও কর্মীরা পুলিশের হয়রানি, ভীতি প্রদর্শন এবং সাধারণভাবে ইউনিয়নবিরোধী আচরণ অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছেন। চলমান ভীতি প্রদর্শনের কৌশলের মধ্যে রয়েছে ইউনিয়নের কার্যালয় ও সভায় পুলিশের ঘন ঘন পরিদর্শন, পুলিশের শ্রমিক ইউনিয়ন সভার ভিডিও রেকর্ড করা ও ছবি তোলা এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমর্থন করার সঙ্গে যুক্ত এনজিওগুলোর ওপর পুলিশের নজরদারি। আশুলিয়ায় শ্রমিক অস্থিরতার ঘটনায় বেশিরভাগ কর্মীকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হলেও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে করা মামলাগুলো মিটিয়ে ফেলতে আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও সেগুলো এখনও বহাল রয়েছে।

শিল্প উপশহর আশুলিয়ায় ২০১৬ সালের অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তৈরি পোশাক শিল্প খাতের শ্রমিকদের উদ্বেগগুলো নিয়ে কাজ করতে একটি স্থায়ী ত্রিপক্ষীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। ২০ সদস্যের এ পরিষদের সভাপতি ও সচিব হন যথাক্রমে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এবং উপসচিব। পরিষদে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার উৎপাদন ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিকেএমইএ) ছয়জন প্রতিনিধি, সরকারের আরও ছয়জন প্রতিনিধি এবং ছয়জন শ্রমিক প্রতিনিধি আছে। পরিষদের বছরে অন্তত তিনবার বৈঠকে বসার কথা। তবে সভাপতি চাইলে প্রয়োজনমত বৈঠক আহ্বান করতে পারবেন। শ্রমিক নেতারা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, পরিষদের শ্রমিক প্রতিনিধিরা নির্বাচিত নন, বরং নিযুক্ত আর তাদের কয়েকজন হয় তৈরি পোশাক শিল্পে সক্রিয় নন, খুবই ছোট শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা আর নয়তো এ শিল্প মালিকদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সলিডারিটি সেন্টারের ভাষ্যমতে, অক্টোবর মাসে সরকার আশুলিয়ার ২০১৬ সালের ঘটনাবলীর জের ধরে ১৫ জন শ্রমিক নেতাকর্মী ও রাজনৈতিক নেতার বিরুদ্ধে মামলা করে। অথচ এর আগে সরকার আশ্বাস দিয়েছিল যে সব মামলা তুলে নেওয়া হবে।

সরকারিভাবে কালেক্টিভ বার্গেনিং এজেন্টস (সিবিএ) হিসেবে স্বীকৃত বৈধভাবে নিবন্ধিত ইউনিয়নগুলো বিভিন্ন দাবিদাওয়া পেশ ও যৌথভাবে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে দর কষাকষির অধিকার রাখে। এ পর্যন্ত খুব কম ক্ষেত্রেই তা ঘটলেও ক্রমে এর উদাহরণ বাড়ছে। নিজেদের বৈধ অধিকার চর্চার কারণে ইউনিয়ন সদস্যদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে আইনে সাজার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনগুলো জানিয়েছে, কর্মীদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে সমঝোতা করতে ইউনিয়নের সক্ষমতার কারণে কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয়ে কোন কোন কোম্পানির শ্রমিকরা তাদের দরকষাকষির অধিকার চর্চা করেনি।

বিদ্যমান আইনে ইউনিয়নগুলোকে তাদের কার্যক্রমের ওপর নিয়োগকর্তাদের হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের নিয়োগকর্তারা প্রায়ই শ্রমিকদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছেন। শ্রমিক সংগঠকগণ ভয়ভীতি প্রদর্শন, অন্যায় আচরণ, চাকুরিচ্যুতি এবং আইনশৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার দ্বারা তদন্তের কথা জানিয়েছেন। শ্রমিক অধিকার বিষয়ক

এনজিওগুলো অভিযোগ করেছে, নিয়োগকর্তারা কালো তালিকাভুক্ত করায় কিছু চাকুরিচ্যুত ইউনিয়ন সদস্য এ খাতে নতুন কাজ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন। মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ বলেছে, কিছুসংখ্যক কারখানা মালিক সংগঠিত শ্রমিকগোষ্ঠীর তরফ থেকে শারীরিক হুমকিসহ হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ করেছেন। তবে এ সব ঘটনার পরিসংখ্যান এবং সুনির্দিষ্ট উদাহরণ উল্লেখ করা হয়নি।

শ্রম আইন অনুযায়ী, ৫০ জনের বেশি কর্মচারী আছে এমন প্রতিটি কারখানায় একটি অংশগ্রহণ কমিটি (পার্টিসিপেশন কমিটি বা পিসি) থাকতে হবে। ২০১৫ সালে সরকার শ্রম আইন সংশোধনের আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুমোদন করে। ওই বিধিমালায় পিসির প্রতিনিধি সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়ার একটি রূপরেখা রয়েছে।

বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটির (বেপজা) অধীনে আরেকটি পৃথক আইনি কাঠামো ইপিজেড বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চলে শ্রমিক অধিকারের বিষয়টির ব্যবস্থাপনা করে। এসব অঞ্চলে কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪ লাখ ৫৮ হাজার। ইপিজেড এর আইনটি শ্রমিকদের দ্বারা নির্বাচিত 'ওয়ার্কার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'কে (ডব্লিউডব্লিউএ) সীমিত কিছু সাংগঠনিক ও দরকষাকষি সংক্রান্ত অধিকার নির্দিষ্ট করে দেয়। এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে যৌথভাবে দরকষাকষি করা এবং বিরোধের সময় এর সদস্যদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার। আইনটির আওতায় ইপিজেড এর অভ্যন্তরে ইউনিয়ন নিষিদ্ধ। ইপিজেড আইনের একটি পুরনো বিধানে সব ধরনের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে তা কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ওই বিধানটির মেয়াদ ২০১৩ সালে শেষ হলেও আইনটি এখনো ধর্মঘটের অধিকার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করছে। যেমন বেপজার চেয়ারপার্সন জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর মনে করলে যে কোনো ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। আইনে ইপিজেড লেবার ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং মীমাংসাকারীর বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান এখনো গঠন করা হয়নি। তার বদলে বরং আটটি শ্রম আদালত ও একটি শ্রম আপিল আদালতে ইপিজেড এর মামলার শুনানি হয়। শ্রমিক উপদেষ্টাদের নিয়ে বেপজার নিজস্ব নজরদারি ব্যবস্থা রয়েছে যারা পরিদর্শক হিসেবে কাজ করে। ইপিজেড-এর ওয়ার্কার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনগুলো বাইরের রাজনৈতিক দল, ইউনিয়ন, ফেডারেশন বা এনজিওর সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক রাখতে পারে না। ইপিজেডগুলোতে অনুমোদিত কোন ধর্মঘটের খবর পাওয়া যায়নি।

সরকার ইউনিয়নগুলোর নিবন্ধনের বিষয়ে একটি প্রমিত কর্মপন্থা (এসওপি) গ্রহণ করেছে। ইপিজেডগুলোতে সংগঠনের অধিকার ও শ্রমিকদের সুরক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা বাদ দিলে জাতীয় শ্রম আইন অনুযায়ী ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্য নিষিদ্ধ। ইউনিয়নের কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার কারণে কোন শ্রমিককে ছাটাই করা হলে শ্রম আদালত তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের আদেশ দিতে পারেন। তবে এ অধিকার প্রয়োগ করার ঘটনা বিরল।

সরকার সবসময় কার্যকর কিংবা ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগযোগ্য আইন কাজে লাগায়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শ্রম আইনে শ্রম আদালতের মাধ্যমে বোঝাপড়া, সমঝোতা ও বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতি রাখা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে যে, একটি কালেক্টিভ-বার্গেনিংয়ের কর্মীরা মীমাংসায় পৌঁছাতে না পারলে তাদের ধর্মঘট করার অধিকার থাকবে। খুব কম ধর্মঘটই অবশ্য জটিল আইনি শর্ত মেনে হয়। ধর্মঘট বা কর্মবিরতি প্রায়ই ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ।

আইন অমান্যের সাজা ২০১৩ সালে বাড়ানো হয়। আইন কার্যকর করার বিধিমালা জারির মাধ্যমে তা সম্ভব হয়। প্রথমবার আইন ভঙ্গের সর্বোচ্চ জরিমানা হচ্ছে বাংলাদেশি ২৫,০০০ টাকা । দ্বিতীয়বার একই অপরাধ করলে জরিমানার অঙ্ক দ্বিগুণ হবে। এ আইনে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থাও রয়েছে। আইন ভঙ্গ করার কারণে কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটলে এক লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা চার বছরের কারা

দণ্ড কিংবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় আপিলের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিলম্বের ঘটনা ঘটেছে।

খ. জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রমে নিষেধাজ্ঞা

আইনে সব ধরনের জোরপূর্বক বা বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাধ্যতামূলক বা চুক্তিভিত্তিক শ্রমের সাজা ৫ থেকে ১২ বছরের কারাদণ্ড এবং ন্যুনতম ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করার যে নজরদারি কৌশল তা কার্যকরভাবে কাজ করেনি। এজন্য সহায়সম্পদ, পরিদর্শন ও প্রতিকারমূলক প্রচেষ্টায় ঘাটতি দেখা গেছে। আইনে আরও বলা হয়েছে যে, বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার ব্যক্তিরা মানবপাচারের শিকার হওয়া মানুষের মতো আশ্রয় ও অন্যান্য সুরক্ষামূলক সেবা পাবে।

বিদেশি চাকরি দেওয়ার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে অনেককে বিদেশে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে বা ঋণের জালে আটকা পড়তে বাধ্য করা হয়েছে। নিয়োগ পাওয়ার জন্য মোটা টাকার সংস্থান করতে অভিবাসী অনেক শ্রমিককে ঋণ করতে হয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ (বায়রা) ভুক্ত নিয়োগকারীরা বৈধভাবে এবং লাইসেন্সবিহীন দালালরা অবৈধভাবে এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বাসাবাড়িতে দাসত্বের মতো পরিস্থিতিতেও শ্রম দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা নেহাতই সীমিত, ঠিকমত বেতন দেওয়া হয় না। এছাড়া তারা হুমকি এবং শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। (সেকশন ৭ সি দেখুন)

পররাষ্ট্র দপ্তরের মানবপাচার বিষয়ক প্রতিবেদন দেখুন এখানে:

www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/

গ) শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিয়োগের ন্যুনতম বয়স

আইন শিশুদের কাজে নিয়োগের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। এ নিয়ন্ত্রণ নির্ভর করে কাজের ধরন ও শিশুর বয়সের ওপর। কাজে নিয়োগের ন্যুনতম বয়স হচ্ছে ১৪। আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগের ন্যুনতম বয়স ১৮। আইনে কিছু ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১২ বা ১৩ বছরের শিশুরা সীমিত ধরনের হাল্কা কাজ করতে পারবে। শিশুরা কারখানা বা খনিতে দিনে ৫ ঘন্টা ও সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত এবং অন্য ধরনের কাজে দিনে ৭ ঘন্টা এবং সপ্তাহে ৪২ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে পারবে। আইন অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলশিক্ষা বাধ্যতামূলক।

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আইন কার্যকর করার কৌশল ও সামর্থ্য শহরাঞ্চলের বিশাল, অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য যথেষ্ট নয়। কর্তৃপক্ষ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের বাইরে শিশু শ্রম বিষয়ক আইন কার্যকর করেছে খুবই কম। কৃষি ও অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক খাতে যেখানে সরকারের কোন নজরদারি নেই সেখানেই বড় সংখ্যক শিশু কাজে নিয়োজিত।

মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৬ শিশুশ্রম জাতীয় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে শিশু শ্রমের ওপর নজর রাখা। তবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পরিষদ বৈঠকে বসেছে মাত্র দুইবার। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারের সৃষ্ট শিশু সুরক্ষানেটওয়ার্কের দায়িত্ব হচ্ছে শিশুশ্রমসহ বিভিন্ন ধরনের আইনকানুন লংঘন ও অনিয়মের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া, গৃহীত ব্যবস্থার নজরদারি করা এবং সুপারিশ করার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

আইনে শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন লংঘনের জন্য সুনির্দিষ্ট সাজার উল্লেখ আছে। এর মধ্যে রয়েছে নামমাত্র ৫০০০ টাকারও কম জরিমানা । এ ধরনের সাজা আইন লংঘন সেভাবে ঠেকাতে পারেনি। গৃহকর্মী নির্যাতনকারী কিছু নিয়োগকারীর বিরুদ্ধে সরকার কখনো কখনো ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।

অনানুষ্ঠানিক খাত ও বাসাবাড়ির কাজে শিশুশ্রমিক নিয়োগের ঘটনা ছিল ব্যাপক। ২০১৬ সালে ঢাকার বস্তিগুলোর ২৭০০ খানার ওপর চালানো ওভারসিজ ডেভলেপমন্ট ইনস্টিটিউট এর একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদেও মধ্যে ১৫ শতাংশই স্কুলে যেতো না এবং পূর্ণকালীন কাজে নিয়োজিত। তারা জাতীয় আইনে নির্ধারিত সপ্তাহে ৪২ ঘন্টার সীমার অনেক বেশি কাজ করতো।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) হিসাবে ছেলেদের জন্য প্রধান কাজের ক্ষেত্র কৃষি এবং মেয়েদের জন্য সেবা খাত। চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পে কর্মরতাদের অধিকার রক্ষায় কর্মরত এনজিও 'ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন' এর তথ্য অনুযায়ী জাহাজভাঙার কাজে নিয়োজিতদের ১১ শতাংশের বয়স ১৮ এর নিচে। 'শিপব্রেকিং প্লাটফর্ম' এর মতো এনজিওগুলো জানিয়েছে, এ শিল্পে শ্রমিকরা কোন প্রশিক্ষণ, নিরাপত্তা উপকরণ, ছুটি, যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা এবং চুক্তি ছাড়াই কাজ করে। তাদের কর্মঘন্টা হয় বেশ দীর্ঘ।

শিশুরা খুব খারাপ ধরনের শিশুশ্রমে নিয়োজিত ছিল। তারা প্রধানত কৃষিখাতের বিপজ্জনক কাজ করেছে। কৃষিতে নিয়োজিত শিশুরা বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, ভারী বোঝা বহন ও ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যুক্ত ছিল। শিশুরা প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করেছে। প্রচন্ড গরমের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তাদের। ধারালো যন্ত্রপাতিতে তাদের আহত হওয়ার হারও বেশ উঁচু। শিশুরা পাথর ও ইট ভাঙা, ডাইংয়ের কাজ, কামারের সহকারি ও নির্মাণ কাজের মতো বিপজ্জনক কাজেও নিয়োজিত ছিল। শুটকি মাছ খাতে বাধ্যতামূলক শিশুশ্রম বিদ্যমান ছিল। এ খাতে শিশুরা ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ ও বিপজ্জনক যন্ত্র নিয়ে কাজ করে। তারেদ কাজের সময়সীমাও দীর্ঘ। শহর এলাকায় পথশিশুরা রিকশা চালানো , আবর্জনা কুড়ানো, রিসাইক্লিং, এটাসেটা বিক্রি, ভিক্ষাবৃত্তি, গাড়ি সারাই ও হোটেল-রেস্তোরাঁর কাজে যুক্ত ছিল। এই শিশুরা জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি, চোরাই মালের কারবার বা মাদক বেচার মতো কাজে ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকিতে ছিল।

শিশুদের প্রায়শই অনানুষ্ঠানিক খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করতে দেখা গেছে যার মধ্যে আছে অনিবন্ধিত পোশাক কারখানা, সড়ক পরিবহন, ম্যানুফ্যাকচারিং ও বিভিন্ন সেবামূলক শিল্প।

সবচেয়ে খারাপ ধরনের শিশুশ্রম বিষয়ে শ্রম দপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য দেখতে এখানে যান:

www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings/

ঘ) চাকুরি ও পেশা বিষয়ক বৈষম্য

শ্রম আইনে লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক মর্যাদা, বর্ণ, যৌন আচরণ বা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে অন্য ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইনে কিছু বলা হয়নি। সংবিধান ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্ম স্থানের ভিত্তিতে কারো প্রতি রাষ্ট্র কর্তৃক নেতিবাচক বৈষম্য করা নিষিদ্ধ করেছে। এতে এই নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সংবিধান পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য 'ইতিবাচক বৈষম্যমূলক'কর্মসূচি রেখেছে।

কম বেতনের তৈরি পোশাক খাতে সাধারণত নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের তুলনামূলকভাবে ভালো সুযোগ থাকে। এ খাতের কর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠই নারী। অফিসিয়াল পরিসংখ্যান অনুযায়ী তৈরি পোশাক খাতে নারী

কর্মীদের হার মোটামুটি ৫৬শতাংশ। তবে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবের কারণে পরিসংখ্যানে অনেক তারতম্য হয়ে থাকে। আইএলও-র হিসাব বলছে, তৈরি পোশাক খাতে নারী কর্মীর হার ৬৫ শতাংশ। নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সাধারণভাবে তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থাপনার কাজে তাদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল। সাধারণত পুরুষকর্মীদের চেয়ে তাদের উপার্জনও কম ছিল- এমনকি একই কাজ করলেও। আন্ড্রেস মেনজেল (সেন্টার ফর ইকনমিক রিসার্চ অ্যান্ড গ্র্যাজুয়েট এডুকেশন ইকনমিকস ইনস্টিটিউট) ও ক্রিস্টোফার উডরাফের (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি) ২০১৭ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ওই বছর রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার নারী কর্মীরা তুলনামূলকভাবে কম বেতন পেয়েছে- উৎপাদনশীলতার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার পরও। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, দক্ষতার বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার পরও মজুরির ব্যবধান প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ থেকে যায়। সমীক্ষা বলছে, পুরুষ কর্মীদের তুলনামূলক বেশি গতিশীলতাই এর কারণ। তাছাড়ানারী কর্মীরা যৌন নিপীড়নসহ নানা ধরনের হয়রানির শিকার হয়েছে।

কিছুসংখ্যক ধর্মীয়, জাতিগত ও অন্যান্য সংখ্যালঘু কর্মী বৈষম্যের শিকার হওয়ার কথা জানিয়েছেন, বিশেষ করে বেসরকারি খাতে। (সেকশন ৬ দেখুন)

ঙ) কাজের গ্রহণযোগ্য পরিবেশ

জাতীয় ন্যূনতম বেতন বোর্ড খাত ধরে ধরে ন্যূনতম মাসিক বেতন ধার্য করেছে। বোর্ড যে কোন সময় বৈঠকে বসতে পারে। তবে শিল্প ধরে ধরে বেতন-ভাতার কাঠামো স্থির করতে এটির একটি ত্রিপক্ষীয় ফোরামে অন্তত ৫ বছরে একবার বসার কথা। আইন অনুযায়ী সরকার নিয়োগকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে বেতন কাঠামো পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে। তৈরি পোশাক খাতে বোর্ড ন্যূনতম মাসিক বেতন ২০১৩ সালে ধার্য ৫৩০০ টাকা (৬৬ ডলার) থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা (৯৫ ডলারের মতো) করেছে। এ ঘোষণার পর তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেছে। তারা ন্যূনতম বেতন ১৬০০০ টাকা (১৯০ ডলারের মতো) চেয়েছে। ওই বেতনবৃদ্ধি ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। অপেক্ষাকৃত জ্যেষ্ঠ কর্মীরাও অসন্তুষ্ট হয়, কারণ তাদের বেতন ন্যূনতম বেতনের হারে বৃদ্ধি পায়নি। এতে করে তাদের কারও কারও বেতন নিতান্ত নতুন কর্মীদের চেয়ে সামান্য বেশি হয়।

সলিডারিটি সেন্টারের ভাষ্য মতে, সেপ্টেম্বর মাসে গোয়েন্দা বাহিনীর একজন কর্মকর্তা চট্টগ্রামে শ্রমিকরা ন্যূনতম বেতন নিয়ে প্রতিবাদ করলে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের শারীরিকভাবে ক্ষতি করার হুমকি দেন। বেপজার তথ্য মতে, পোশাক খাতে কর্মীদের বেতন অনেক সময়ই ন্যূনতম বেতনের চেয়ে বেশি ছিল। আর ইপিজেড এর বেতন সাধারণ গড়পড়তা বেতনের চেয়ে উঁচু হারে হয়।

চা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন হচ্ছে সবচেয়ে কম ন্যূনতম বেতন গুলোর একটি। ২০১৩ সালে একটি সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে তা দিনে ৬৯ টাকা (৮৬ সেন্ট) হিসেবে স্থির হয়। নির্ধারিত এসব কোনো ন্যূনতম বেতন দিয়েই শহর অঞ্চলে মানসম্পন্ন জীবনযাপন সম্ভব নয়। ন্যূনতম বেতনের ক্ষেত্রে মূদ্রাস্ফীতি বিবেচনায় ধরা হয়নি। বিশ্বব্যাংকের উপাত্ত অনুযায়ী এ দেশে ২০১০ সাল থেকে মূদ্রাস্ফীতির গড় হার বছরে ৬ থেকে ৮ শতাংশ। তবে বেতন বোর্ড কোনো কোনো খাতে মজুরির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে জীবনযাত্রার ব্যয়ের বিষয়টি সমন্বয় করেছে।

আইন অনুযায়ী একটি প্রমিত কর্মদিবস হচ্ছে আট ঘন্টার। প্রমিত কর্মসপ্তাহ হচ্ছে ৪৮ ঘন্টা। তবে তা ওভারটাইম ভাতা প্রদান সাপেক্ষে ৬০ ঘন্টা পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। ওভারটাইমের হার হচ্ছে মূল বেতনের দ্বিগুণ। কর্মীর ওপর ওভারটাইম বাধ্যতামূলক করা যাবে না। দিনে ছয় ঘন্টার বেশি কাজ করলে কর্মীদের অবশ্যই এক ঘন্টার বিশ্রাম দিতে হবে। আর পাঁচ ঘন্টার বেশি কাজ করলে শ্রমিক পাবে আধ

ঘণ্টার বিশ্রাম। কারখানা শ্রমিকরা সপ্তাহে একদিন বন্ধ পাবে। দোকান কর্মচারীরা সপ্তাহে দেড়দিন ছুটি পায়।

শ্রম আইনে কর্ম সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া আইনের সংশোধনীর মাধ্যমে কর্মী নিরাপত্তা কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আইনে বলা হয়েছে প্রতি কর্মীকে বছরে পূর্ণ বেতনসহ অন্তত ১১ দিন উৎসব ছুটি দিতে হবে। সিবিএর সঙ্গে আলোচনাক্রমে নিয়োগকর্তা ছুটির দিন তারিখ ঠিক করবেন। সিবিএ না থাকলে পার্টিসিপেশন কমিটির সঙ্গে পরামর্শক্রমে তা করা হবে।

শ্রম আইন কার্যকরের বিধিমালায় কারখানাগুলোতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণণা করা হয়েছে। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় ২১৭৫টি নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলোতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং সিবিএর মনোনীত কর্মী উভয়েই থাকবে। সিবিএ না থাকলে কমিটিতে থাকবে কারখানার ওয়ার্কার পার্টিসিপেশন কমিটির (ডব্লিউপিসি) কর্মী প্রতিনিধিরা। যেখানে ইউনিয়ন বা ডব্লিউপিসি কোনটাই নেই সেখানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই) প্রতিনিধি ঠিক করার জন্য কর্মীদের মধ্যে নির্বাচন করবে।

সরকার সব খাতে ন্যূনতম বেতন, কর্মঘন্টা এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও প্রমিত স্বাস্থ্যমান কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেনি। তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর বর্ধিত মনোযোগের কারণে কিছু পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্সের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু খাতের সবক্ষেত্রে সম্পদ, পরিদর্শন ও প্রতিকারের বিষয়গুলো যথেষ্ট নয়। এছাড়া আইন লংঘনের জন্য যে শাস্তি তা আইনভঙ্গ ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট কার্যকর নয়।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) সম্পদ পরিদর্শন ও সমস্যার সমাধান করার জন্য যথেষ্ট নয়। ২০১৭ সালে ডিআইএফই ৩১৭ জন শ্রম পরিদর্শককে কাজে লাগিয়েছিল। তবে ৮ কোটি ৩০ লাখের বেশি কর্মীর বিশাল বাহিনীর দেশে এই সংখ্যা হয়তো যথেষ্ট নয়। আর আদালতে মামলা করা ছাড়া নিয়োগ কর্তাদেও বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়ার কর্তৃত্ব ডিআইএফই-এর নেই। তবে মন্ত্রণালয় ডিআইএফই-এর কর্মীসংখ্যা ও কারিগরি সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০১৩ সালের রানা প্লাজা ভবন ধসের ঘটনায় ১১৩৮ জন শ্রমিক নিহত এবং আড়াই হাজারের বেশি আহত হন। ওই দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি পোশাক খাতের বেসরকারি কোম্পানি, বিদেশি সরকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ৩৭৮০ টির বেশি তৈরি পোশাক কারখানা পরিদর্শন করে। অনেক কারখানা নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। তবে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থায়ন করতে ব্যর্থ হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিকারের গতি ছিল ধীর। বেসরকারি ক্রেতাদের দুটি জোট অ্যালায়েন্স ও অ্যাকর্ড ২৪০০ কারখানার প্রাথমিক অগ্নি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিদর্শন করে। কিন্তু এসব উদ্যোগের বাইরে পোশাক কারখানার বিষয়ে সরকারের নজরদারি ও আইনপ্রয়োগ সীমিত। আবার এসব উদ্যোগ কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক কারখানা ঘিরে। এতে করে হাজারো অনানুষ্ঠানিক তৈরি পোশাক এবং পোশাক-বহির্ভূত কারখানা যথাযথ পর্যবেক্ষণের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বয়লার বা রাসায়নিকজনিত বিস্ফোরণ আগুনবহির্ভূত শিল্প দুর্ঘটনার প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি করেছে। নিজেদের দায়িত্বে থাকা ৪০০ টির বেশি কারখানার নিরাপত্তা সমস্যার সফল সমাধানের পর অ্যালায়েন্স বছরের শেষদিকে এর কার্যক্রম সমাপ্ত করে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি ব্র্যান্ড সংস্কার হওয়া কারখানাগুলোতে নিরাপত্তার সংস্কৃতি বহাল রাখতে একটি নতুন স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গে কাজ করছে।

রানা প্লাজার মালিক সোহেল রানা ও আরও ৪০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগের মামলার বিচার শুরু হয় ২০১৬ সালে। রানা একটি দুর্নীতিবিরোধী কমিশনের কাছে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির

বিবরণ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় তার সর্বোচ্চ শাস্তি তিনবছরের কারাদণ্ড হয়। রানা ও অন্যদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা অব্যাহত থাকে।

২০১২ সালের তাজরিন ফ্যাশনসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্তদের বিচার শুরু হয় ২০১৫ সালে। এ মামলায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মাহমুদা আখতার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক দেলোয়ার হোসেনসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, বছরের শেষদিকে মামলাটির বিচারকাজ থমকে ছিল।

শ্রমিকদের সংগঠনগুলো বলেছে যে, আইনে উল্লেখ করে দেওয়া নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত মান যথাযথ এবং আরও বেশি কারখানা কমপ্লায়েন্সের পথে উদ্যোগ নিয়েছে। নতুন আইনে কমপ্লায়েন্স না মানার জন্য সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এটি আইন লংঘন ঠেকাতে পারেনি।

কর্মঘন্টার বৈধ সীমা বিষয়ক আইন নিয়মিতভাবেই লংঘন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানা খাতে নিয়োগকর্তারা অনেক সময় রপ্তানির সময়সীমা রক্ষার জন্য কর্মীদের দিনে ১২ ঘন্টা বা আরও বেশি কাজ করিয়েছেন কিন্তু তারা কর্মীদের সবসময় বাড়তি কাজের জন্য আর্থিকভাবে পুষিয়ে দেননি। সলিডারিটি সেন্টারের ভাষ্য, অনেক সময় কর্মীরা স্বেচ্ছায় বৈধ সীমার বাইরে ওভারটাইম কাজ করেছে। অনেক ঘটনায় দেখা গেছে, নিয়োগকারীরা কর্মীদের বেতন দিতে দেরি করেছেন বা পূর্ণ ছুটির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

দেশের বেশিরভাগ নাগরিক কাজ করে অনানুষ্ঠানিক খাতে। তবে এ বিশাল খাতের শ্রম পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া গিয়েছে খুব কম। এ খাতে শ্রম আইন কার্যকর করাও ছিল কঠিন। বিবিএস এর ২০১০ সালের শ্রমশক্তি সমীক্ষায় বলা হয়েছিল, বাংলাদেশের ৫৬.৭ মিলিয়ন কর্মীর মধ্যে ৪৭.৩ মিলিয়নই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ছিল।